৭.০২ মহাচক্র – Bangla Library

৭.০২ মহাচক্র – Bangla Library

মহাচক্র–১০২

পুলিশ প্রধানের হাতে রয়েছে গুলীভরা রিভলভার। তিনি তাকাচ্ছেন প্রতিটি যাত্রীর মুখের দিকে। কারণ এই যাত্রীদের মধ্যেই রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর।

কে এই দস্যু বনহুর কে জানে।

সবার মনে একই প্রশ্ন।

প্রত্যেক যাত্রীই তার পাশের আসনে উপবিষ্ট যাত্রীর মুখের দিকে সন্দিহান দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছেন, কারণ সেই যে দস্যু বনহুর নয়, তা কে জানে! যাত্রীরা বিমান থেকে নেমে পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

পুলিশ প্রধান বললেন–আপনারা বিচলিত হবেন না। আমরা জানতে পেরেছি দস্যু বনহুর এই বিমানে যাত্রী হিসেবে আছে। আমরা তাকে অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে।

পুলিশ প্রধানের সান্তনাবাণী যাত্রীদের মনে মোটেই সাহস সঞ্চয় করতে পারলো না। তারা বিমান থেকে নেমে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

পুলিশ প্রধান পুনরায় যাত্রীদের লক্ষ্য করে বললেন–আপনারা সবাই একে একে নেমে পড়ুন। নিচে আমাদের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আছে। আশা করি দস্যু বনহুরকে আমরা সহজেই গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে। আপনাদের ভীতির কোনো কারণ নেই।

যাত্রীরা এবার বিমান থেকে অবতরণের আশায় এক একজন করে বিমানের সিঁড়িপথের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো।

পুলিশ প্রধান চলে এলেন সিঁড়িমুখে কারণ যাত্রীগণ সবাই নেমে পড়বে, এমতাবস্থায় সিঁড়ির দিকে নজর রাখা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করলেন তিনি।

যাত্রীরা প্রায় দেড়শতের বেশি হবে, সবাই বিমান থেকে নেমে আসছে এক এক করে।

পুলিশ প্রধান পকেট থেকে বনহুরের ফটো বের করে বসার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলেন।

না, কারও সঙ্গে মিল খাচ্ছে না ফটোখানা।

পুলিশপ্রধান হাঁপিয়ে পড়লেন।

তবে কি সব মিথ্যা?

এ বিমানে দস্যু বনহুর নেই?

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন দস্যু বনহুরের কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না তখন পুনরায় যাত্রিগণকে বিমানে উঠে বসার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

এবার যাত্রীরা বিমানে আরোহণ করবার সময় একটু বিব্রত বোধ করলো, কারণ তাদের মন থেকে এখনও সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়নি দস্যু বনহুরের নামটা।

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে যাত্রীরা বিমানে উঠে বসলো বটে কিন্তু তারা আশঙ্কিত মন নিয়ে তাকাতে লাগলো এ-ওর মুখের দিকে।

পুনরায় সমস্ত যাত্রীকে চেক করে দেখা হলো।

পুলিশপ্রধান এবার আশ্বস্ত হয়ে নেমে পড়লেন বিমান থেকে।

বিমান এবার রানওয়ে চক্কর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

আফ্রিকা যাত্রীবাহী বিমানখানা এবার রানওয়ের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে সোজা চলে গেলো দক্ষিণ দিকে, তারপর উড়ে উঠলো আকাশে।

আফ্রিকা পুলিশবাহিনীসহ পুলিশপ্রধান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বিমান বন্দরে। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে তিনি নতুন রেকর্ড স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার আশা ব্যর্থ হলো।

তিনি ধারণা করলেন নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর বিমান বন্দরে আশেপাশে কোথাও আত্মগোপন করে আছে। পুলিশপ্রধান দলবল নিয়ে সমস্ত বিমান বন্দরে তল্লাশি চালিয়ে চললেন কিন্তু কোথাও বনহুরের সন্ধান পাওয়া গেলো না।

আফ্রিকা বিমান বন্দরে যখন আফ্রিকা পুলিশপ্রধান বনহুরের তল্লাশি চালিয়ে চলছেন তখন আফ্রিকা জঙ্গলের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে যাত্রীবাহী বিমানখানা।

এখনও যাত্রীদের মুখমন্ডল প্রসন্ন হয়নি।

তাদের মন থেকে মুছে যায়নি দস্যু বনহুরের নামটা, তারা আতঙ্কগ্রস্তভাবে চারদিকে লক্ষ্য করছিলো। নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর তাদের প্লেনেই আছে, এই তাদের ধারণা!

যাত্রীদের ধারণা মিথ্যা নয়।

প্লেনখানা যখন আফ্রিকা জঙ্গল অতিক্রম করে সাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো তখন হঠাৎ সাউন্ডবক্সে একটা ভারী কণ্ঠস্বর শোনা গেলো–আপনারা বিচলিত হবেন না, প্লেনখানা দক্ষিণ আফ্রিকার গভীর জঙ্গল অতিক্রম করে এখন সাগরপাড়ি দিচ্ছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের প্লেনখানা মংস্কো দ্বীপে অবতরণ করবে।

সংকেতসূচক প্রতিধ্বনি যাত্রীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করলো। কারণ পথে কোনো দ্বীপে বিমানখানা অবতরণ করার কথা ছিলো না। হঠাৎ এই ঘোষণা হওয়ায় যাত্রীদের মনে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। তারা অনেকেই বলাবলি করতে লাগলো, এমন অবস্থার কারণ কি?

কিন্তু তার জবাব কেউ দিতে পারলো না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমানখানা সাগরের বক্ষ লক্ষ্য করে নিচের দিকে অবতরণ করতে লাগলো।

অদূরে সাগরবক্ষে পরিলক্ষিত হচ্ছে একটা দ্বীপ।

মংস্কো দ্বীপ।

আফ্রিকার পুলিশপ্রধান তখন আফ্রিকা বিমান বন্দরের আশেপাশে জোর তদন্ত চালিয়ে চলেছেন।

বিমানখানা অবতরণ সাগরবক্ষের উপরে নীল আকাশে চক্কর দিচ্ছে। যাত্রী এবং বিমানবালা যারা ছিলো তারা বিস্ময় নিয়ে তাকাচ্ছে এদিকে ওদিকে। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

মংস্কো দ্বীপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

শুধু শেওলা জাতীয় আগাছা আর বালুকারাশি।

বিমান করবার পূর্ব মুহূর্তে বিমানের দ্বিতীয় চালক ঘোষণা করলো–দস্যু বনহুর বিমান চালনা করছে। একটু পূর্বে যে গলার স্বর আমরা সাউন্ড বক্সে শুনতে পেয়েছি তা স্বয়ং দস্যু বনহুরের, কাজেই আপনারা সাবধান! এ বিমানে চারজন

বিমান চালক ছিলো। তারমধ্যে প্রথম চালকই হলো দস্যু বনহুর। যাত্রীদের মুখে কে যেন এক পোচ কালি মাখিয়ে দিলো।

যাত্রীদের মধ্যে যাদের নিকটে অস্ত্র ছিলো তারা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হলো। মরতে হয় দস্যু বনহুরের সঙ্গে লড়াই করে মরবেন।

এমন কি বিমানবালা ও বিমান চালকগণও অস্ত্র নিয়ে তৈরি হলো।

বিমানখানা চক্রাকারে ঘুরছিলো।

শোনা গেলো পূর্বের সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর–বিমানখানা অবতরণ করবার আর দরকার হবে না ...আপনারা মঙ্গলমত ফিরে যান...কথা শেষ হতে না হতেই প্যারাসুট সহ কোনো এক ব্যক্তি বিমান থেকে লাফিয়ে পড়লো শূন্য আকাশে।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র।

কিন্তু প্যারাসুটধারী ব্যক্তি প্লেন থেকে অনেক নিচে নেমে গেলো। বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত গুলী গিয়ে আর স্পর্শ করতে পারলো না প্যারাসুটধারীর দেহ।

বিমান চালকগণ সতর্ক হলো, কারণ বিমানখানা এখন দিক বিহীনভাবে আপন ইচ্ছায় উড়ে চলেছে। তারা দ্রুত বিমানের গতি আয়ত্ব করে নিলো। একটু পূর্বে সাউন্ড বক্সের ঘোষণায় তারা জানতে পেরেছিলো স্বয়ং দস্যু বনহুরই বিমান চালনা করছিলো।

এখন বুঝতে পারলো দস্যু বনহুর এই বিমানেই ছিলো এবং সে পাইলটদের মধ্যেই আত্মগোপন করেছিলো। সেই কারণে খুঁজে পাননি আফ্রিকা পুলিশপ্রধান এমনভাবে তদন্ত চালিয়েও।

বিমান নিয়ে পাইলটগণ তাদের গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে ফিরে চললো।

যাত্রীগণ হকচকিয়ে গিয়েছিলো। এবার তারা নিশ্চিন্ত হলো, কারণ তারা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলো দস্যু বনহুর এ বিমানেই ছিলো এবং এখন সে নেই।

সবাই নিজের চোখে দেখেছে দস্যু বনহুর প্যারাসুট সহ লাফিয়ে পড়েছে শূন্য আকাশে। আর সে ফিরে আসবে না বা আসতে পারবে না এ বিশ্বাস তাদের

আছে। কাজেই তারা নিশ্চিন্ত।

বনহুর যতই নিচে নামছে তার কানে ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন। প্রচন্ড প্রচন্ড ঢেউগুলো উছলে পড়ছে একে অপরের গায়ে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো সাগরের ঠিক মাঝামাঝি মস্কো দ্বীপ। বনহুর এ দ্বীপের নামই শুনেছিলো কিন্তু চোখে দেখেনি কোনোদিন।

আফ্রিকা জঙ্গলের সর্ববৃহৎ সর্প রাজগুলো নাকি এই মংস্কো দ্বীপে এসে আস্তানা গেড়েছে। তবে কতদূর সত্য তা জানে না বনহুর।

প্যারাসুট নিয়ে বনহুর মংস্কো দ্বীপে অবতরণ করার চেষ্টা চালালো কারণ সাগরবক্ষে পড়লে হাঙ্গর আর বিরাট বিরাট কুমীরের মুখ গহ্বরে যেতে তার বিলম্ব হবে না। তার চেয়ে আফ্রিকা পুলিশ বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করা অনেক শ্রেয় ছিলো।

সাগরের গর্জন ভীষণভাবে কর্ণগোচর হচ্ছে।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে মংস্কো দ্বীপটার উপরে।

বনহুর প্যারাসুট সহ নেমে আসছে নিচে।

একেবারে সাগর আর দ্বীপের কাছাকাছি এসে পড়েছে বনহুর।

ভাগ্যে কি আছে কে জানে।

প্যারাসুটসহ বনহুর একেবারে এসে পড়লো দ্বীপটার কিনারে, আর একটু হলেই সাগরের বুকে পড়তো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্যারাসুটসহ বনহুর মস্কো দ্বীপে অবতরণ করলো। তাকিয়ে বিস্মিত হলো– নতুন এক জগৎ।

চারদিকে অদ্ভুত ধরনের বৃক্ষলতাগুল্ম। কতকটা শেওলা ধরনের উদ্ভিদ বলা যায়। স্থানে স্থানে জমকালো পাথরের স্তূপ ঠিক ছোটোখাটো পাহাড়ের মত।

বনহুর শরীর থেকে প্যারাসুটের রশি খুলে ফেললো। তারপর পাহাড়টার দিকে এগুলো। নিকটবর্তী হতেই দেখতে পেলো বিরাট এক অজগর কুন্ডলি পাকিয়ে বসে আছে একটা পাথরখন্ডের পাশে।

শেওলা ধরনের উদ্ভিদ জন্মেছে সাপটার দেহে।

কেমন যেন অদ্ভুত ভয়ংকর জীব বলে মনে হচ্ছে।

বনহুরের সাহসী মনটাও কেপে উঠলো।

ভাগ্যিস সাপটা তাকে দেখতে পায়নি। দেখতে পেলে তাড়া করে আসতো নিশ্চয়ই। নিজকে সামলে নিয়ে পিছু হটতে লাগলো সে।

কিছুটা পিছুতেই কোনো এক নরম তুলতুলে বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বনহুর পড়ে গেলো মাটিতে। তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়াতেই তার নজর পড়লো বিরাট আকার একটা সুলকায় পিপে বা ড্রাম দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে।

বিস্ময়ভরা চোখে অবাক হয়ে দেখছে বনহুর।

পিপেটার গায়ে গোলাকার দুটি চোখ।

নিচে একটা মুখ।

যেন পিপের গায়ে ছুরি দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে।

বনহুরের দিকে পিপে জীবটা কেমন ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছে।

ঠিক তেমনিভাবে তাকাচ্ছে বনহুরও।

এমন ধরনের অবস্থায় বনহুর বহুবার পড়েছে কিন্তু এমন অদ্ভুত জীবনের পাল্লায় সে পড়েনি।

আশ্চর্য হয়ে ঢোক গিললো বনহুর।

জীবটা হা করলো।

মুখ গহ্বরটা যেন একটা জালা বা ড্রামের ফাটল।

বনহুরের দিকে পিপেটা এগিয়ে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে সরে দাঁড়ালো বনহুর।

নাহলে বিরাট জীবটার দেহ তার দেহটাকে চাপ দিতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বনহুর সরে দাঁড়াতেই সর্পরাজ তাকে লক্ষ্য করে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে উঠলো।

সাপটার নিশ্বাস যেন তার দেহে এসে লাগলো।

কি ভয়ংকর উষ্ণ হাওয়া!

বনহুর তাকিয়ে আছে, ঐ মুহূর্তে সর্পরাজের ঠিক মুখের কাছে এসে পড়লো সেই বিস্ময়কর পিপেরাজ।

সর্পরাজ তাকে আক্রমণ করলো।

পিপে রাজের দেহটাকে সর্পরাজ জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে।

পিপেরাজ গড়াতে শুরু করলো।

চলল উল্টোপাল্টে লড়াই।

বনহুর কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, হঠাৎ তার স্মরণ হলো এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই উচিত হবে না। শেষে লড়াই করতে করতে জীব দুটি তার দেহে এসে গড়িয়ে না পড়ে।

তাড়াহুড়া করে বনহুর সরে দাঁড়ালো।

একটা বড় পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো সে। গোলাকার জীবটার দেহ সর্পরাজ ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরেছে এবং দাঁত দিয়ে গোলাকার জীবটার দেহে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে।

সর্পরাজের দংশনে গোলাকার জীবটার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে লাল টকটকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ভীষণ সে দৃশ্য।

বনহুর বেশিক্ষণ এ দৃশ্য উপভোগ করবার সুযোগ পেলো না।

পেছনে একটা হুস হুস্ শব্দ তাকে উদগ্রীব করে তুললো।

অবাক হয়ে বনহুর পেছনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখলো একটা বিরাট আকার কচ্ছপ হুস হুস শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

কচ্ছপের দেহটা একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মত লাগছে। সমস্ত দেহ শেওলা জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঢাকা মনে হচ্ছে। গলাটা উঁচু করে চার পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে পিছু হটে একেবারে সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ালো।

কচ্ছপটা বেশ উঁচুতে! সে চারপায়ে ভর করে বনহুরকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

কচ্ছপটার লক্ষ্য হলো বনহুর।

বুঝতে পারলো বনহুর কচ্ছপটা যদি তার দেহের উপর লাফিয়ে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নেই। একেবারে পিষে থেতলে যাবে তার দেহটা।

কিন্তু কচ্ছপটা আর বিলম্ব না করে লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।

বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে উবু হয়ে সরে দাঁড়ালো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে কচ্ছপটা লাফিয়ে পড়লো কিন্তু সে বনহুরের দেহে না পড়ে একেবারে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়লো।

বনহুর ফিরে তাকালো।

দেখলো কচ্ছপটা সমুদ্র গর্ভে লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড ঢেউয়ের তলায় তলিয়ে গেলো।

বনহুর স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ফিরে দাঁড়ালো।

এগিয়ে চললো বনহুর দ্বীপটার উপরের দিকে।

নতুন এবং অদ্ভুত এ দ্বীপ।

উপরের দিকে তাকালো বনহুর।

আকাশটা ঠিক মাথার উপর মনে হচ্ছে।

সাদা সাদা মেঘগুলো যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে নীল আকাশের কিছু কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। ভারী সুন্দর মনোরম দৃশ্য!

বনহুরের মনটা অনেকটা সচ্ছ মনে হচ্ছে। কারণ মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে নিশ্বাস নিচ্ছে সে। পাহাড় এবং ঝোঁপঝাড়, আগাছা, তারপর শুধু বালুকারাশি, সীমাহীন প্রান্তর।

বনহুর এগিয়ে চললো।

যদিও তার মনে বড় ইচ্ছা হচ্ছিলো একবার সর্পরাজ এবং পিপে মহারাজের মল্লযুদ্ধটা দর্শন করে কিন্তু সে সখকে দমন করে এগুলো বনহুর।

*

হঠাৎ সর্দার নিখোঁজ হওয়ায় আস্তানার অনুচরগণ অত্যন্ত উল্কণ্ঠিত হয়ে পড়লো। এমন কি রহমান, কায়েস এদের কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় গেলো সর্দার।

রহমান, কায়েস এরা জানে আফ্রিকা থেকে সর্দার রওয়ানা দিয়েছিলো কিন্তু তারপর আর কিছু জানে না। ওয়্যারলেসে বারবার চেষ্টা করেছে রহমান সর্দারের সঙ্গে যে ক্ষুদ্র ওয়্যারলেস আছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু যোগাযোগ হয়নি। রহমান ব্যর্থ হয়েছে।

এ কথা সত্য বনহুর তার ওয়্যারলেস যন্ত্রটি হারিয়ে ফেলেছিলো। যখন সে প্যারাসুট নিয়ে শূন্যে লাফিয়ে পড়েছিলো তখন তার প্যান্টের পকেট থেকে ছিটকে পড়েছিলো নিচে সমুদ্র গর্ভে।

তাই আস্তানার সঙ্গে বনহুরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো।

কায়েস এবং রহমানও বহু চেষ্টা করেও সন্ধান পায়নি তাদের সর্দারের।

এমনভাবে নিখোঁজ বনহুর বহুবার হয়েছে তাই, বলে একেবারে কিছু না জানিয়ে গেলো সে কোথায়। সর্দার যখন আফ্রিকা বিমান বন্দরে বিমানে আরোহণ করেছেন তখনও তারা সংবাদ জানে, তারপর আর কিছুই জানে না।

এখানে বনহুরের আস্তানায় যখন বনহুরকে নিয়ে তার অনুচরগণ ভাবছে তখন বনহুর মংস্কো দ্বীপে এক নতুন অভিযানে লিপ্ত।

একটা সমতল স্থানে এসে দাঁড়াতেই বনহুর চমকে উঠলো। তার পায়ের নিচের বালুকারাশি যেন দুলে উঠলো। একটু একটু কাঁপছে বালুকারাশি তাতে সন্দেহ নেই।

বনহুর সজাগ হয়ে সরে দাঁড়ালো।

সরে দাঁড়াতেই তার মনে হলো সেখানেও পায়ের নিচের মাটি দুলছে। তবে কি ভূমিকম্প শুরু হলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না।

বালুকারাশি উঁচু হয়ে উঠছে যেন।

ঠিক যেমন উই টিবি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তেমনি ফুলে উঠলো বালুকরাশির স্থানে স্থানে।

বনহুর সেখান থেকেও সরে গিয়ে একটা বৃহৎ আকার পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়ালো। দৃষ্টি তার রয়েছে সম্মুখে সেই ফুলে উঠা বালুকারাশির দিকে।

বিস্ময়কর ব্যাপার।

বালুকারাশি কিছুটা ফুলে উঠার পর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা জমকালো পদার্থ।

বনহুর ভালভাবে তাকিয়ে দেখছে।

বালুর উঁচু টিবিগুলোর ভেতর থেকে বেরুলো এক একটা গোলাকার মাথা এবং জ্বলজ্বলে দুটো করে চোখ। আরও একটু অপেক্ষা করার পর বনহুর হতভম্ব হলো। বালুকারাশির তলদেশ থেকে বেরিয়ে এলো এক একটা পিপে মহারাজের বাচ্চা।

হাত নেই, পা নেই, গোলাকার দেহ, শুধু দুটি চোখ। আর চোখের নিচের অংশে একটা মুখ।

অদ্ভুত জীব তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে বনহুরের বুঝতে বাকি রইলো না সেই পিপে জীবটার বাচ্চা এগুলো।

জীবটা তাহলে বালুকারাশির মধ্যে ডিম প্রসব করে এবং তা থেকে বালুকারাশির মধ্যে জন্ম নেয় পিপের বাচ্চা।

একসঙ্গে প্রায় দশ–বারোটা বাচ্চা বেরিয়ে এলো।

পিপে বাচ্চাগুলো বেশ গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে।

এলোমেলোভাবে গড়াতে শুরু করলো।

তারপর এক একটা চলে গেলো এক একদিকে। কিছুক্ষণেই ফাঁকা হয়ে এলো জায়গাটা।

বনহুর সব অবাক চোখে দেখলো।

এমন বিস্ময়কর ব্যাপার ইতিপূর্বে তার সম্মুখে ঘটেনি। পিপে জীবের বাচ্চাগুলো এত দ্রুত বালুকারাশির মধ্য হতে বেরিয়ে এলো, আবার এত শীঘ্র তারা বেশ বড় হলো এবং উধাও হয়ে গেলো দ্রুতগতিতে।

কিন্তু এ সব নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবার সময় নেই বনহুরের। কিছু খাদ্য তাকে সংগ্রহ করতে হবে যা খেয়ে এই নতুন অজানা দ্বীপে জীবন ধারণ করতে পারবে সে।

তারপর আসবে রাত্রি।

মহারাত্রি বলা যায়।

কারণ এমন ভয়ঙ্কর দ্বীপে রাত্রিযাপন কি যে ভীতিকর তা সবাই আন্দাজ করে নিতে পারবে।

বনহুর বালুকারাশি পেরিয়ে অনেকটা পথ চলে এলো, ঝোঁপঝাড় আগাছা নানা ধরনের অজানা অচেনা গাছপালা।

মাঝে মাঝে অচেনা জীবজন্তু নজরে পড়ছে তার।

বনহুরের সঙ্গে ক্ষুদে ওয়্যারলেস মেশিন ছিলো এবং ছিলো নানা ধরনের ক্ষুদে অস্ত্রশস্ত্র তবে রিভলভার তার সাথী বলা যায়।

ওয়্যারলেস মেশিনটা সাগরে পড়ে গেলেও রিভলভার ও আরও দুএকটা প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র মেশিন তার সঙ্গে এখনও রয়েছে। তাই বনহুর কিছুটা নিশ্চিত বটে।

আনমনে এগুচ্ছে বনহুর।

বেশ ক্ষুধা অনুভব করছে সে।

কিছু না খেলে শরীরটা নিস্তেজ হয়ে আসবে।

তবু চলেছে।

কিছু দেখছে না যা খেয়ে ক্ষুধা মেটানো যায়।

বনহুর পুনরায় সমুদ্রধারে ফিরে চললো।

তবে পূর্বের স্থানে নয়।

এ দিকটা সম্পূর্ণ আলাদা জায়গা।

উঁচুনীচু পাহাড়ের মত পাথরের খন্ড। পাথরখন্ডগুলোর ফাঁকে ফাঁকে শেওলা জমে আগাছার রূপ নিয়েছে।

বনহুর একটা পাথরে বসে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে তীরে পাথরখন্ডগুলোর উপরে।

সেকি ভীষণ শব্দ।

কানে তালা লাগার যোগাড়।

বনহুর তাকিয়ে আছে নির্বিকার দৃষ্টি মেলো। ভাবছে অনেক কথা, এই মংস্কো দ্বীপের নাম সে শুনেছিলো কিন্তু দেখেনি কোনোদিন। অদ্ভুত এ দ্বীপ, আর সে দ্বীপের জীবগুলো আরও অদ্ভুত।

বালির তলদেশ থেকে অদ্ভুতভাবে সৃষ্টি হলো পিপে আকার জীবগুলোর বাচ্চা এবং এত তাড়াতাড়ি সেগুলো বেড়ে উঠলো যে সে কখনও দেখেনি। শুধু জীবগুলো বেড়েই উঠলো না, তারা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেলো দৃষ্টির আড়ালে।

বনহুর কতকটা আনমনা হয়ে পড়েছিলো, ঠিক ঐ সময় সমুদ্র তলদেশ থেকে ধীরে ধীরে ভেসে উঠলো একটা জমকালো বস্তু।

বনহুরের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

সে তাড়াতাড়ি একটা বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে ফেললো। তার দৃষ্টি রয়েছে সম্মুখে সমুদ্রের দিকে কালো বস্তুটার উপর।

বস্তুটা ধীরে ধীরে মাথা তুলে দিচ্ছে উপরের দিকে।

বনহুর মনে করলে যে কালো বস্তুটা সমুদ্র গহ্বর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসছে সেটা নিশ্চয়ই কোনো জীবন্ত জীব।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলো বনহুর ঐ কালোমত বস্তুটা কোনো জীব নয়, একটা ডুবোজাহাজের মাস্তুল। বনহুর সজাগ হয়ে দাঁড়ালো, যদিও তাকে দেখা যাচ্ছে না তবু সে আড়ালে আরও নিবিড় হয়ে দাঁড়ালো।

চোখে তার বিস্ময় ফুটে উঠেছে, আড়ালে আত্মগোপন করে নিতান্ত মনোযোগর সঙ্গে তাকালো।

ততক্ষণে জমকালো বস্তুটা আরও বেশি উপরে জেগে উঠেছে। আরও একটু পর একেবারে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠলো একটা আশ্চর্য ধরনের জাহাজ। তবে হঠাৎ কেউ দেখলে ওটা জাহাজ বলে মনে করবে না। কোনো ডুবন্ত জীব বলেই মনে হবে।

কারণ জাহাজখানার কোনো জানালা বা ছিদ্রপথ ছিলো না।

সমস্ত বডি জমকালো চকচক কভারে ঢাকা।

সূর্যের তাপে জমকালো কভার ঢাকা জাহাজখানা ঝকমক করে উঠলো।

বনহুর তার পকেট থেকে বের করলো ক্ষুদে দূরবীক্ষণ যন্ত্রখানা! চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগলো গভীর মনোযোগ সহকারে।

জাহাজখানা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ জেগে উঠলো সমুদ্রের বুকে। ঠিক কচ্ছপের আকার জাহাজখানা, বনহুর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

মাত্র কয়েক মিনিট, তারই মধ্যে আকাশে দেখা গেলো একটা প্লেন মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করে ঠিক জাহাজখানার সোজা উপরে এসে চক্কর দিতে শুরু করলো।

অবাক হলো বনহুর।

কারণ এত অল্প সময়ে প্লেনখানা কি করে ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছলো।

জাহাজের উপরিভাগটা কচ্ছপের পিঠের মত কিন্তু ঠিক উঁচু নয়। বেশ চেপ্টা ধরনের।

আকাশে বিমানখানা যখন চক্কর দিচ্ছিলো তখন জাহাজখানা স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

ধীরে ধীরে জাহাজখানার উপরের অংশ কিছুটা খুলে গেলো।

প্লেনখানা এবার আস্তে করে এসে জাহাজখানার ছাদে নেমে পড়লো।

বনহুর চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে দেখছে।

যদিও সে সমুদ্রতীর থেকে অনেক দূরে তবু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো।

প্লেনখানা জাহাজটার উপরে নেমে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো প্লেনের দরজা।

ভিতর থেকে নেমে এলো তিনজন অদ্ভুত পোশাকপরা লোক।

বিস্ময়কর পোশাকে সজ্জিত তারা।

প্রত্যেক ব্যক্তির পিঠে এক একটা প্যাকেট বা বাক্স।

বনহুর লক্ষ্য করলো অদ্ভুত পোশাকপরা লোকগুলো প্লেন থেকে অবতরণ করে জাহাজের খোলসের মধ্যে প্রবেশ করলো।

তারপর পুনরায় যখন তারা বেরিয়ে এলো তখন দেখতে পেলো বনহুর অদ্ভুত পোশাক পরিহিত লোকগুলোর পিঠে সেই প্যাকেট অথবা বাক্সগুলো বাধা নেই।

তারা প্লেনের সিঁড়ি বেড়ে উপরে উঠে পড়তেই সিঁড়ি গুটিয়ে প্লেনের তলদেশে প্রবেশ করলো।

আশ্চর্য ধরনের সিঁড়ি বনহুর এই প্রথম দেখলো।

সবচেয়ে বনহুর বেশি অবাক হলো প্লেন থেকে যে লোকগুলো অবতরণ করলো তারা নীরবে কাজ করে গেলো, কোনো কথা কেউ বলছে না বা বললো না।

প্লেনে ওরা চেপে বসার সঙ্গে সঙ্গে প্লেনখানা আকাশে উড়ে উঠলো, এবার জাহাজখানা পুনরায় ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলো সমুদ্রের গভীর অতলে।

বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, নিশ্চয়ই এখানে এই সমুদ্র গহ্বরে লুকিয়ে আছে কোনো গভীর রহস্য।

জাহাজখানা ঠিক কচ্ছপের মত দেখতে।

পিঠে একটা ঢাকনা।

তবে জাহাজখানা সমুদ্র গহ্বরে তলিয়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে তার পিঠের ঢাকনা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু জাহাজে কোনো ব্যক্তি নজরে পড়লো না, বড় বিস্ময়কর ব্যাপার।

বনহুর দেখছে প্লেনখানা আকাশে মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আর জাহাজখানা তলিয়ে গেলো সমুদ্রগর্ভে।

গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো বনহুর।

সে ভাবতেও পারেনি মস্কো দ্বীপে তাকে এভাবে গভীর এক রহস্য আচ্ছাদন করে ফেলবে।

অনেক ভেবেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলো না বনহুর। জাহাজখানা যে রহস্যময় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তেমনি প্লেনখানাও রহস্যজনক। হঠাৎ জাহাজখানা ভেসে উঠলো তার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ভেসে উঠলো প্লেনটা। নিশ্চয়ই জাহাজখানার সঙ্গে প্লেনটার সংযোগ আছে।

কিন্তু কিসের সংযোগ?

কি আছে ঐ জাহাজে?

আর প্লেনখানা থেকে যারা অবতরণ করলো তারাই বা কারা আর কিই বা তাদের পিঠের প্যাকেটে বাধা ছিলো।

*

আশা জাভেদের পিঠে হাত রেখে বললো–রহস্যময় বীণার সন্ধান তোমাকে করতেই হবে। ঐ বীণার মধ্যে আছে এক অমূল্য সম্পদ। যা সাত রাজার ধনের

চেয়েও মূল্যবান।

বললো জাভেদ–আমি বহু সন্ধান করেছি কিন্তু সেই বিস্ময়কর বীণার সন্ধান পাইনি।

আমি জানি সেই বীণা কোথায় আছে তবে তার সন্ধান জানতে তোমার বাপুজী।

জাভেদ আনমনা হয়ে পড়লো।

বললো আশা–তোমার বাপুজী আজও ফিরে আসেনি তবে সে আফ্রিকা বিমান বন্দর ত্যাগ করেছে এটা ঠিক।

জাভেদ বললো–আমি সন্ধান নিয়ে জানতে পারলাম বাপু ঐ দিনই ঐ প্লেনে চলে এসেছে।

আমি জানি জাভেদ।

আশা আম্মু, বাপুজী তাহলে কোথায় গেলো?

তা নিয়ে আমিও ভাবছি। তবে জানি সে কোনো এমন জায়গায় রয়েছে যেখান থেকে তোমার আমার কাছে কোনো সন্ধান পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না।

কিন্তু বাপুতো নিশ্চুপ থাকার লোক নয়

সেকথা সত্য জাভেদ, তবে আমার মন বলছে নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছেনইলে কথা শেষ করতে পারলো না আশা।

জাভেদ সোজা হয়ে দাঁড়ালো, বললো–আশা আম্মু, তুমি আদেশ করো আমি বাপুর সন্ধানে আফ্রিকা গমন করি?

না।

কেন তুমি বারণ করছ?

জানি তুমি তার সন্ধান পাবে না।

তাহলে?

বনহুরকে কেউ বন্দী করতে পারবে না এটা আমি জানি। সে যেখানেই থাক ফিরে আসবেই। আশার মন চলে যায় দূরে অনেক দূরে কোনো এক অজানা দেশে যেখানে বনহুর হয় বন্দী অবস্থায় রয়েছে নয় মুক্ত বিহঙ্গের মত বিচরণ করে ফিরছে।

বললো জাভেদ–আশা আম্মু!

বলো?

বাপুর সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয় বলবে আমাকে?

ঠিক মনে নেই তবে দীর্ঘ সময়।

বাপুকে তুমি বড় ভালবাসো, তাই না?

জাভেদের কথায় আশার মুখমন্ডল রাঙা হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লো আশা, বললো সে–জাভেদ, তুমি আর কতদিন আম্মুকে ছেড়ে আমার কাছে থাকবে বলো?

যতদিন আমার মন চাইবে ততদিন আমি তোমার কাছে থাকবো। কিন্তু তোমাকে আজ বলতেই হবে আশা আম্মু, তুমি আল্লুকে ভালোবাসো কিনা?

পাগল ছেলে, তোমার বাপুকে ভালো না বাসলে তোমাকে কি আপন করে নিতে পারতাম? তাকে ভালবাসি বলেই তো তোমাকে আমি নিজ সন্তানের মত মনে করি

আশা আম্মু!

জাভেদ, তোমার বাপু আমার স্বপ্ন, আমার সাধনা, আমার ধ্যান। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে আশার কণ্ঠ, সে দ্রুত চলে যায় সেখান থেকে।

জাভেদ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর একটু হেসে চলে যায় সেখান থেকে। কিন্তু মন থেকে তার আশা আম্মুর সেই মুহূর্তের মুখচ্ছবি মুছে যায় না। কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে তার কথাগুলো।

জাভেদ এগিয়ে এসে ঝর্ণার পাশে দাঁড়ালো।

পাহাড়িয়া ঝর্ণাধারা কুলকুল করে বয়ে চলেছে।

জাভেদ ঝর্ণার পাশে এসে দাঁড়াতেই কেউ যেন তার কাঁধে হাত রাখলো।

চমকে ফিরে তাকালো জাভেদ।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো সে, এই গভীর জঙ্গলে শুধু বাস করে আশা আর সে। কোনো মানব এখানে নেই, দেখেওনি কোনোদিন। এ জঙ্গলটা বড় নির্জন। এমন কি হিংস্র জীব জন্তুও বড় একটা দেখা যায় না।

কে এই ব্যক্তি যার দেহে বাঘের চামড়ার বর্ম। পায়ে অদ্ভুত ধরনের পা–বন্দ। হাতে এবং মাথায় চামড়ার আচ্ছাদন।

বয়স তার জাভেদের কাছাকাছি না হলেও কিছুদিনের বড় হবে।

চোখ দুটো লাল টকটকে।

দীর্ঘ গোফ নাকের দুপাশে ঝুলে পড়েছে লম্বালম্বি হয়ে।

জাভেদ ফিরে তাকাতেই সেই অদ্ভুত ব্যক্তিটি এক বজ্রঘুষি বসিয়ে দিলো জাভেদের চোয়ালে।

জাভেদ কিছু বুঝবার পূর্বেই চোয়ালে ঘুষির আঘাত খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিলো সে। শান্ত সিংহশাবক যেমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তেমনি জাভেদ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো।

সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর সে ভাল করে তাকালো নতুন আগন্তুকটার দিকে।

দক্ষিণ হাতখানা তার মুষ্ঠিবদ্ধ হলো। কালবিলম্ব না করে ভীষণ এক মুষ্ঠাঘাত বসিয়ে দিলো জাভেদ সেই নতুন আগন্তুকটার নাকে।

সঙ্গে সঙ্গে জোয়ান লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো ঝরণার পানিতে।

জাভেদের বজ্রমুষ্ঠির আঘাতে আগন্তুক লোকটার নাক দিয়ে লাল টকটকে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। ঝরণার পানি লালে লাল হয়ে উঠলো।

জাভেদ ঝরণায় নেমে ওর কাধ ধরে টেনে তুললো, তারপর পুনরায় আর এক বজ্রমুষ্ঠাঘাত।

কিন্তু এবার আগন্তুক ছিটকে পড়লো না, সে টাল সামলে নিয়ে আক্রমণ করলো জাভেদকে।

ঝরণার ধারে শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ।

জাভেদ যেমন তেমনি নতুন শত্রুটা।

কারও দেহে শক্তি কম নয়।

জাভেদও নিরস্ত্র তেমনি আগন্তুকটাও অস্ত্রহীন।

দুজনের মধ্যে চললো মল্লযুদ্ধ।

উভয়েরই নাকমুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

সেকি ভীষণ যুদ্ধ!

হঠাৎ পড়ে গেলো আগন্তুকটা, নিচে ছিলো একটা পাথরখন্ড।

আগন্তুকের মাথাটা ভয়ংকরভাবে থেতলে গেলো।

রক্তে লাল হয়ে উঠলো শুকনো সাদা পাথরখন্ডটা। বার দুই ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেলো ওর দেহটা।

জাভেদ হিংস্র জন্তুর মত নিজের বুকে আঘাত করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। তারপর তুলে নিলো কাঁধে ওর রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহটা।

ফিরে এলো।

উঠানে এসে ডাকলো জাভেদ–আশা আম্মু....

ডাক শুনে বেরিয়ে এলো আশা।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো ভীষণভাবে।

জাভেদের কাঁধে একটা রক্তাক্ত দেহ।

আশা দ্রুত এসে দাঁড়ালো জাভেদের পাশে, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো–একি, এর এ অবস্থা কেন? একে কোথায় পেলে জাভেদ?

জাভেদকাধ থেকে প্রাণহীন দেহটা মাটিতে নিক্ষেপ করে বললো–আশা আম্মু, তোমার সীমানার মধ্যে প্রবেশ করেছিলো। তাই ওকে সমুচিত শাস্তি দিয়েছি।

আশা ঝুঁকে পড়লো মৃতদেহটার মুখের উপর। আশ্চর্য কণ্ঠে বললো–জাভেদ এই তরুণকে হত্যা করে তুমি ভুল করেছো, কারণ এর চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারছি এ জাম্বুরীদের লোক। বড় ভয়ংকর হিংস্র এরা।

জাভেদ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললো–তার চেয়েও বেশি হিংস্র আমি। আশা আম্মু, আমি ওকে সমুচিত শাস্তি দিয়েছি।

কিন্তু জানো এর পরিণতি কত সাংঘাতিক...

আমি কোনো কিছুকে ভয় করি না আশা আম্মু।

জাভেদ, এর পোশাক পরিচ্ছদে আমি যতটুকু বুঝতে পারছি তাতে একেবারে সঠিক যে, এ তরুণ হিরু পর্বতের বাসিন্দা সর্দার নরসিংয়ের বংশধর।

তাতে আমার কি?

হাঁ, তাতে তোমার কিছু নয়, আমারও নয়! একটু থেমে বললো আশা–ভয় আমিও করি না জাভেদ। তবে তোমার জেনে রাখা ভাল, কারণ সব সময় সাবধানে চলাই শ্রেয়।

পুনরায় হাসিতে ফেটে পড়লো জাভেদ।

আশা দীপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জাভেদের মুখের দিকে। এ যে একেবারে স্বয়ং দস্যু বনহুরের প্রতিচ্ছবি। সেই নাক, মুখ, চোখ, সেই বলিষ্ঠ সুন্দর দেহ।

হাসলে বড় সুন্দর লাগে বনহুরকে, তেমনি বড় সুন্দর লাগে জাভেদকে।

জাভেদ হাসি থামিয়ে বলে–অমন করে কি দেখছো আশা আম্মু।

তোমার মুখ।

কেন, আমাকে এই কি প্রথম দেখছো?

যত দেখি ততই তোকে দেখতে ইচ্ছা করে।

জানি তুমি আমাকে বেশি ভালবাসো। কিন্তু আশা আম্মু, তুমি আমাকে যত আদর কর তার চেয়ে বেশি আমি আদর করি তোমাকে, কারণ তুমি আমার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করোনি তাই…

হাসলো আশা।

একটু পর বললো–যাও জাভেদ, মৃতদেহটাকে দূরে ফেলে দিয়ে এসো।

জাভেদ আশার আদেশ পালন করলো।

লাশটা তুলে নিলো কাঁধে, তারপর চলে গেলো গভীর জঙ্গলের মধ্যে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো জাভেদ।

হিংস্র জন্তু তার শত্রুকে পরাজিত করার পর যেমন উল্লসিত হয় তেমনি জাভেদকে মনে হচ্ছিলো।

আশা বসে ছিলো।

তার দেহে শিকারের ড্রেস।

জাভেদ ফিরে এসে বললো–তোমাকে এভাবে প্রস্তুত দেখছি কেন?

বললো আশা–বড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। জাভেদ, তুমি মনে করোনা জাম্বুরী সর্দার আমাদের উপর আক্রমণ না চালিয়ে শান্ত থাকবে।

এ তুমি কি বলছে আশা আম্মু!

হাঁ, যাকে তুমি হত্যা করেছে তাকে আমি না চিনলেও আমি জানি ও জাম্বুরী সর্দারের লোক। জাম্বুরী সর্দার যখন জানতে পারবে তার লোককে তুমি হত্যা করেছে তখন যুদ্ধ বাধবে। সে যুদ্ধে জয়লাভ করতে গেলে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমি সর্বদা প্রস্তুত আছি।

শোন জাভেদ, এবার আসল কথা শোন।

বলো?

সেই বীণা তোমাকে উদ্ধার করতে হবে, যে বীণা মিস বার্বারা হীরা পর্বতে তোমার বাপুর হাতে অর্পণ করেছিলো।

আমি জানি!

কিন্তু...

আশা আম্মু, আমি যেমন করে হোক ঐ বীণা খুঁজে বের করবোই।

বেশ।

আমি চললাম।

শোন, ঐ বীণা তোমার বাপু রহমানের হাতে সমর্পণ করে রহমান সেই বীণা কি করেছে সেই জানে, কাজেই ঐ বীণা উদ্ধার করতে হলে রহমানের সহায়তা দরকার। একটু থেমে বললো আশা–জাভেদ, ঐ বীণার মধ্যে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তা আমি জানি।

সত্যি তুমি জানো?

হাঁ এসো আমরা নিভৃত স্থানে বসে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি। কারণ তোমার জানা দরকার।

আশা আর জাভেদ এসে বসলো একটা গাছের গুঁড়ির উপরে।

বহুকালের পুরোন গাছটা বাঁকা হয়ে পড়েছিলো। গাছের গুঁড়িটা ছিলো ঠিক কোনো একটা গোলাকার আসন বা ঐ ধরনের কোনো বস্তুর মত।

আশা আর জাভেদ পাশাপাশি বসে পড়লো। বললো আশা–মিস বার্বারা ছিলো মিশরের কোনো এক ধনী ব্যক্তির দুহিতা। সে একদিন জানতে পারলো তার পিতা তার সম্পূর্ণ সম্পত্তি কোনো এক প্রতিষ্ঠানকে দান করবেন। কথাটা শোনার পর সে উন্মত্ত হয়ে উঠলো, পিতার সম্পত্তির মোহ তাকে উন্মাদ করে তুললো। মিস বাবা মনে মনে ঠিক করলো তার পিতাকে হত্যা করে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে।

বললো জাভেদ–তারপর?

তারপর পিতা জানতে পারলো সবকিছু, তার কন্যা তাকে হত্যা করে সম্পত্তি নিজ আয়ত্তে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তখন পিতা তার সমস্ত সম্পত্তি, বিক্রি করে কোটি কোটি টাকার মূল্যবান মণিমুক্তা কিনে হীরা পর্বতের কোনো এক গুহায় রেখে দিলো। এবং নিজে পথ ভুলে যাবার সম্ভাবনা স্মরণ করে একটা ক্ষুদ্র টেপরেকর্ডে এ পথের নির্দেশ রেখে বীণার মধ্যে লুকিয়ে রাখলো টেপরেকর্ড যন্ত্রখানা।

জাভেদ বললো, আমি সব বুঝতে পেরেছি। বীণার রহস্য এবার আমার কাছে উদ্ঘাটন হয়ে গেছে।

জাভেদের কথা শেষ হয় না, হঠাৎ একটা তীর এসে বিদ্ধ হয় জাভেদ আর আশার মাঝামাঝি।

জাভেদ আর আশা ফিরে তাকাবার পূর্বেই তাদের চারপাশ ঘিরে ফেলে অসংখ্য জাম্বুরী। প্রত্যেকের হাতে এক একটা বর্শা আর তীরধনু।

আশা শুধু ইংগিত করলো।

জাভেদ বুঝতে পারলো এরা জাম্বুরী, যাদের কথা আশা কিছু পূর্বে বলেছিলো তাকে। জাভেদ আরও বুঝলো জাম্বুরীরা ঠিক তাদের অনুচরটার লাশ দেখে ফেলেছে। যদিও সে অতি সাবধানে লাশটাকে ফেলে দিয়ে এসেছিলো।

এখন উপায়, জাম্বুরীরা এক একজন যেন দৈত্যরাজ।

জাভেদ আর আশাকে ওরা ধরে ফেললো।

বেঁধে ফেললো কঠিন রশি দিয়ে।

জাভেদকে যে মুহূর্তে রশি দিয়ে ওরা বাধতে গিয়েছিল সেই দন্ডে একটা মল্লযুদ্ধ শুরু হতো কিন্তু আশার ইংগিত তাকে ক্ষান্ত করেছে।

জাম্বুরীগণ আশা আর জাভেদকে বেঁধে নিয়ে চললো।

জাভেদ হিংস্র জন্তুর মত ফোঁস ফোঁস করছিলো। সে সুযোগ সন্ধান করছিলো কেমন করে উদ্ধার পাওয়া যায়। জাভেদ ঠিক বনহুরের মতই দুঃসাহসী, কাজেই তাকে আটকে রাখা সাধ্য কার।

জাম্বুরীরা যখন ওদের দুজনকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন জাভেদ লক্ষ্য করছিলো তার অশ্বটি দূরে তাদেরকে অনুসরণ করছে।

জাভেদ ও আশাকে নিয়ে জাম্বুরীদল যখন উঁচু একটি টিলা পার হচ্ছিলো তখন হঠাৎ জাভেদ এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিলো। শিষ দিয়ে ছুটে গেলো টিলার ধারে, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়লো নিচে।

টিলার নিচেই ছিলো জাভেদের অশ্ব, কারণ অশ্বটি জাভেদকে লক্ষ্য রেখে তাদের সঙ্গে এগুচ্ছিলো। জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে পড়লো।

তারপর কে পায় জাভেদকে।

জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাম্বুরীগণ বর্শা নিক্ষেপ করতে লাগলো তাকে লক্ষ্য করে কিন্তু জাভেদ মুহূর্তে তাদের বর্শার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

জাম্বুরীগণ বিমুখ হয়ে ফিরে এলো টিলার কিনারা থেকে।

ওরা আশাকে আরও মজবুত করে বেঁধে ফেললো এবং টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো।

আশা কোনো বাধা দিলো না।

*

বনহুর বুঝতে পারলো এরা কোনো মহাচক্রী যাদের ক্ষমতা রয়েছে সীমাহীন। ডুবো জাহাজখানা আশ্চর্যই শুধু নয়, একেবারে বিস্ময়কর। বনহুর ভেবে নিলো যেমন করে হোক এই মহাচক্রের রহস্য তাকে উদঘাটন করতেই হবে।

বনহুর ভীষণ ক্ষুধা অনুভব করছে।

এমন এক দ্বীপে বনহুর এসে পৌঁছেছে যে দ্বীপে মানুষের খাদ্য বলে কিছু নেই। তেমন কোনো ফলযুক্ত বৃক্ষ নজরে পড়ছে না।

সমুদ্রে পানির অভাব নেই কিন্তু সে পানি পান করা অসম্ভব। সুপেয় পানির প্রয়োজন। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, জাহাজখানা ততক্ষণে তলিয়ে গেছে গভীর অতলে।

বনহুর এগিয়ে যাচ্ছে।

সূর্যের তাপ বাড়ছে।

বনহুর ক্লান্ত হয়ে আসে, তবু সে সন্ধান করে ফিরছে। যদি এই গভীর রহস্যের কোনো কিনারা করা যায়।

বেলা শেষ হয়ে আসে।

হতাশ হয়ে পড়ে বনহুর।

না জানি আবার কোন বিপদ ওৎ পেতে আছে তার জন্য।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

বনহুর একটা সমতল স্থানে হাতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। পিস্তলখানা পকেটে ঠিক স্থানে আছে কিনা একবার দেখে নিলো, তারপর নিশ্চিন্তভাবে চোখ বন্ধ করলো।

মাত্র কয়েক মিনিট কেটেছে।

একটা শব্দ কানে এলো বনহুরের।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো সে, হঠাৎ পাশেই একটা পাথর নড়ে উঠলো।

বনহুর ক্ষিপ্তগতিতে স্থান ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, তারপর দ্রুত আত্মগোপন করলো।

সরে দাঁড়াতেই তার নজর পড়লো ওপাশে পর্বতমালার মত উঁচু স্থানে একটা পর্বতের পাশের কিছু অংশ সরে গেলো আস্তে আস্তে। একটা গুহামুখ বেরিয়ে এলো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গুহামুখটা।

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ্য করে চললো গুহামুখ হতে কেউ বের হয় কিনা। কিন্তু বেশ কিছু সময় কেটে গেলো কোনো জনপ্রাণী ঐ গুহামুখ থেকে বের হলো না।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে বনহুর তাকিয়ে আছে, হঠাৎ পর্বতমালার কিছু অংশ ফাঁক হয়ে গেলো, তারপর গুহামুখ বেরিয়ে এলো কিন্তু কোনো কিছু নজরে আসছে না, ব্যাপার কি?

বনহুর এদিক ওদিক লক্ষ্য রেখে সোজা চলে এলো ঠিক যে উঁচু পর্বতটার গায়ে গুহামুখ বেরিয়েছিলো সেই জায়গায়। ভিতরে একটা সুড়ঙ্গপথ আছে বলে মনে হলো।

বনহুর কিছু চিন্তা করলো তারপর প্রবেশ করলো সেই বিস্ময়কর সুড়ঙ্গে।

বনহুর সুড়ঙ্গ বা গুহায় প্রবেশ করতেই সঙ্গে সঙ্গে গুহামুখের পাথরখানা সরে এলো এবং গুহামুখ বন্ধ হয়ে গেলো। বনহুর চমকে একপাশে সরে দাঁড়ালো। সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো তাকে কেউ লক্ষ্য করছে, নাহলে এভাবে গুহামুখ বন্ধ হয়ে যেতো না।

. এখন কি করা যায়।

বনহুর গুহামধ্যে প্রবেশ করবার পূর্বমুহূর্তে ঐ চিন্তাই করেছিলো। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা থেকে বিরত না থাকাই ভাল এবং এ

জন্য যদি মৃত্যুও ঘটে তাতে কোনো। দুঃখ বা ক্ষোভ থাকবে না।

বনহুর তাই সোজা প্রবেশ করলো সেই অদ্ভুত গুহায়।

প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে বন্ধ হয়ে গেলো গুহা বা সুড়ঙ্গমুখ। বনহুর হকচকিয়ে গেলো, চমকে পিছন ফিরে তাকালো কিন্তু আর কোনো উপায় নেই গুহামুখ খুলবার।

তবু বনহুর একবার এগিয়ে এসে ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি দিলো, অমনি বনহুরের পায়ের তলা থেকে সরে গেলো মেঝেটা।

বনহুর পড়ে গেলো কোনো এক গর্তের মধ্যে।

ঝাপসা অন্ধকার।

বনহুর তাকালো চারদিকে।

তার চার পাশে সুউচ্চ দেয়াল।

বনহুর উপরে তাকালো।

জমাট অন্ধকার মনে হচ্ছে উপরের দিকটা।

কড়কড় শব্দ হচ্ছে।

একপাশের দেয়াল এগিয়ে আসছে তার দিকে।

দেয়ালখানা এগিয়ে এসে অপর দেয়ালের সঙ্গে মিশে যাবে, তাহলে থেতলে চেপটা হয়ে যাবে বনহুরের দেহটা।

বনহুর গভীরভাবে চিন্তা করছে।

এখন কি তার করণীয়?

নিজকে বাঁচাবার কোনো পথ নেই।

বনহুর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো।

ততক্ষণে দেয়ালটা একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে। বনহুর ভেবে পায় না এমন অজানা এক দ্বীপে এমন বিস্ময়কর গুহা এবং গুহার মধ্যে রহস্যময় মৃত্যুকূপ কি করে এলো। বনহুর দুহাতে দেয়ালখানা ঠেলে ধরলো, প্রাণপণ শক্তিতে কিন্তু দেয়ালখানা তাকে ঠেলে নিয়ে আসছে।

বনহুর বুঝতে পারলো কেউ অন্তরালে থেকে কাজ করছে। এই নির্জন অজানা দেশে কে তার এমন শত্রু আছে যার সঙ্গে তার কোনো দিন সংঘর্ষ বেঁধেছিলো। বনহুর মরিয়া হয়ে বাঁচার চেষ্টা করে।

আর রক্ষা নেই।

মৃত্যু তাকে আলিঙ্গন করবে।

বনহুর প্রাণপণে দেয়ালটাকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, সমস্ত শরীর তার ঘামে ভিজে চুপসে উঠলো। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড হঠাৎ তার কানে এলো অট্টহাসির শব্দ। কি ভয়ংকর সে

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো দেয়ালখানা।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

যাক উপস্থিত মৃত্যু থেকে রেহাই পেলো।

সে উপরের দিকে তাকালো।

কিন্তু কিছুই নজরে পড়ছে না।

শুধু জমাট অন্ধকার।

অট্টহাসি থেমে গেছে।

বনহুর ভেবে পাচ্ছে না ব্যাপারখানা কি?

নিশ্চয়ই মহাচক্র রহস্য ঘনীভূত হয়ে আসছে। এখানে কোনো কুচক্রী আস্তানা গেড়ে বসে আছে যা আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে।

বনহুর খুশি হলো।

মরণকে সে ভয় করে না।

জীবন দিয়ে সে এই রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করবে। সেই সুবোজাহাজখানার কথা মনে পড়লো। সেই প্লেনখানার কথাও স্মরণ হলো, সব যেন কেমন এক মহাচক্র

বনহুরের চিন্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, দেয়ালটা আবার সরে আসছে বলে মনে হলো তার। বনহুর লক্ষ্য করলো একটা সুমিষ্ট গন্ধ তার নাকে প্রবেশ করছে।

বনহুর বুঝতে পারলো আর রক্ষা নেই তার নিশ্বাসে কোনো বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করা হলো, এক্ষুণি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে সে, তারপর তাকে পিষে থেতলে হত্যা করা হবে। বনহুর মেঝেতে বসে পড়লো তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন দেখলো চারদিকে শুধু অন্ধকার। কোনো সাড়াশব্দ নেই, মনে হলো সে মৃত্যুবরণ করেছে।

স্মরণ হলো সেই দেয়ালের কথা।

ভয়ংকর কঠিন একটা দেয়াল এগিয়ে আসছে। মৃত্যুদূতের মত, কিছুতেই সে ঠেকাতে পারছে না। তারপর একটা সুমিষ্ট গন্ধ। তারপর কিছু স্মরণ নেই–তাহলে কি তার মৃত্যু ঘটেনি? বনহুর হাত দিয়ে মাথার চুল স্পর্শ করলো। হাঁ, সে জীবিত আছে। মৃত্যু তাকে আলিঙ্গন করেনি।

বনহুর শুয়ে আছে কঠিন শক্ত মেঝেতে তা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলো। তবে কি সেই জায়গা–সেই চারপাশ দেয়াল–বেষ্টিত মৃত্যু কূপ–হাঁ, তাই হবে। তাহলে দেয়ালটা তাকে পিষে থেতলে দেয়নি।

বনহুর উঠে বসলো।

হাতড়িয়ে অনুভব করে নিলে সবকিছু।

হঠাৎ হাতে কোনো একটা শক্ত বস্তু অনুভব করে সজাগ হয়ে উঠলো।

বস্তুটা মেঝের সঙ্গে মজবুত করে আটকানো।

কোনো একটা প্যাঁচ জাতীয় জিনিস সেটা।

হঠাৎ বনহুরের মনে একটা আশার সঞ্চার হলে নিশ্চয়ই এটা কোনো এমন বস্তু হবে যা দিয়ে তার উদ্ধারের পথ পাওয়া যেতে পারে।

বনহুর বস্তুটা বেশ ভালভাবে নেড়েচেড়ে দেখলো।

তারপর ঘোরাবার চেষ্টা করলো বস্তুটাকে।

হঠাৎ নড়ে উঠলো বস্তুটা।

সঙ্গে সঙ্গে একপাশের দেয়াল ফাঁক হয়ে গেলো যাদুমন্ত্রে মত। বনহুর দেখলো সুন্দর একটা দরজা।

হঠাৎ এমন একটা পথ তার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি বনহুর।

তখনও বনহুর বসে ছিলো মেঝেতে।

দরজার ওপাশে কিছুটা আলোর ছটা নজরে পড়লো। এপাশ জমাট অন্ধকারে ভরা, কাজেই সামান্য আলো আভাস তাকে সজাগ করে তুললো।

মাথা উঁচু করে দেখে নিলো।

তারপর উঠে দাঁড়ালো মেঝেটার উপর।

মাথাটা কিছু ঝিমঝিম করলেও তার বেশি কষ্ট হচ্ছে না তবে ক্ষুধা আর পিপাসা বেশ অনুভব

বনহুর কোনো দিকে খেয়াল না করে সোজা ঐ উন্মুক্ত পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

যেমনি বনহুর পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে অমনি সে দেখতে পেলো সামনে একটা ঝুলন্ত লিফট।

বনহুর সেই লিফটে উঠে দাঁড়িয়ে লিফটের দেয়ালে সুইচে চাপ দিলো, লিফট সা সা করে এগিয়ে যাচ্ছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বনহুর প্রতীক্ষা করছে।

না জানি লিফটখানা তাকে কোথায় নিয়ে পৌঁছবে। বনহুর তার ক্ষুদে পিস্তলখানা বের করে নিলো। লিফটখানা তাকে নিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ থেমে গেলো। কিন্তু যে স্থানে এসে লিফটখানা থেমে গেলো সে স্থানটি গভীর শূন্য। একেবারে মহাশূন্য যাকে বলে, কিছু নজরে পড়ছে না।

বনহুর লিফট থেকে নিচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

একটু আশংকিত হলো সে, কারণ নিচে কিছু নজরে আসছে না।

লিফটখানার কোন দেয়াল নেই, বা কোনো আবরণ আচ্ছাদন নেই। সামান্য পা রাখার জায়গা ছাড়া আর কিছু নেই! বনহুর ভাবছে, হঠাৎ আবার সেই হাসির শব্দ।

ভীষণ আর ভয়ংকর সেই আওয়াজ।

এটা কি মানুষের কণ্ঠস্বর না কোনো যান্ত্রিক আওয়াজ। ভালভাবে কিছু ভাবতে পারে না বনহুর।

অট্টহাসির শব্দ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিফটের তলদেশ খসে পড়লো।

বনহুর দ্রুত ধরে ফেললো লিফটের নিচের অংশের একটা দিক। তাই রক্ষা না হলে মহাশূন্যের গভীরদেশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো তার দেহটা।

বনহুরের দক্ষিণ হাতে ছিলো পিস্তলখানা।

বাম হাতে সে ধরে ফেলেছিলো লিফটের নিচের অংশ। এবার বনহুর পিস্তলখানা ঝুলন্ত অবস্থায় পকেটে রেখে দুহাতে শক্ত করে ধরে লিফটের খোলা অংশ।

লিফট নামছে।

নিচে নামছে।

হঠাৎ নিচে মহাশূন্যে আলোর ছটা পরিলক্ষিত হলো। বনহুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভীষণ চমকে উঠলো, মহাশূন্য বলে এতক্ষণ যা ধারণা করেছিলো তা নয়। নিচে ভীষণ আকার সূতীক্ষ্ণ লৌহফলা থরে থরে সাজানো রয়েছে। কোনোক্রমে বনহুরের হাত একবার শিথিল হলেই মৃত্যু এবং সে মৃত্যু। অতি ভয়ংকর।

নিচে সূতীক্ষ্ণ ধারালো ফলাগুলো আলোর ছটায় চক চক করছে।

আলোর ছটাটা কোথা থেকে আসছে বলা যাচ্ছে না।

বড় উজ্জ্বল আলোর ছটা।

বনহুর ঝুলছে।

লিফট নামছে।

এক সময় এসে তার দেহটা ধাক্কা খাবে সূতীক্ষ্ণ ফলাগুলোর সঙ্গে। সেঁতে যাবে তার দেহটা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর অমনিভাবে আর কতক্ষণ ধরে রাখবে লিফটের নিচের খোলা অংশ। হাত দুখানা আরষ্ট হয়ে আসছে। এবার তাকে নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যু বরণ করতে হলো।

লিফটখানার যে অংশ বনহুর এতক্ষণ ধরে রেখেছিলো এবার সে অংশ খুলে যাবার উপক্রম হলো। আবার বনহুর এটে ধরলো অপর অংশ।

আশ্চর্য ঐ অংশ ধরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ঝুলন্ত লিফটখানা থেমে গেলো। একটুও নড়ছে না আর। বনহুর দেখলো নিচের সূতীক্ষ্ণ ধার ফলাগুলো ক্রমান্বয়ে তলিয়ে যাচ্ছে।

মাত্র কয়েক মিনিট তার মধ্যেই নিচের সেই ফলাগুলো বিলুপ্ত হলো অথবা প্রবেশ করলো কোনো বস্তুর মধ্যে। আর কতক্ষণ বনহুর ধরে রাখবে লিফটখানা, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে হাতে।

এবার নিচে তাকিয়ে দেখলো সূতীক্ষ্ণ ফলাগুলো আর নজরে পড়ছে না।

বনহুর নিজের হাত দুখানাকে মুক্ত করে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়লো নিচে।

একটু পূর্বে যেখানে সূতীক্ষ্ণ ফলাগুলো ছিলো সেখানে এখন সম্পূর্ণ সমতল।

বনহুর মোটেই আঘাত পেলো না।

যদিও লিফট থেকে নিচে মহাশূন্য বলে এক সময় মনে হচ্ছিলো এখন তা মহাশূন্য নয়। মেঝে কিন্তু পাথর নয়, শক্ত তক্তা বা ঐ জাতীয় কিছু হবে।

বনহুর নিচে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশে ঘিরে ধরলো। পাঁচ ছজন লোক।

বিস্ময়কর মুখোশধারী লোকগুলো।

প্রত্যেকের হাতে এক একটা বিস্ময়কর অস্ত্র।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

চারপাশে লোকগুলো তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু কারও মুখে কোনো কথা নেই।

সবাই যেন যন্ত্রচালিত পুতুল।

বনহুর আবার শুনতে পেলো সেই অট্টহাসির শব্দ।

ঐ শব্দ ছাড়া বনহুর অন্য কোনো শব্দ এ পর্যন্ত শুনতে পায়নি। বনহুরের মনে পড়লো ডুবোজাহাজখানা ভেসে উঠার পর একটা প্লেন নেমে এসেছিলো জাহাজখানার উপরে।

তারপর প্লেনখানা নেমে পড়েছিলো জাহাজটার পিঠে তখন দেখেছিলো তিনজন অদ্ভুত পোশাকপরা লোককে নামতে এবং তাদের পিঠে ছিলো কোনো

প্যাকেট

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই এক পাশে দরজার মত একটা সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবার সময় নেই বনহুরের, অস্ত্রধারীরা তাকে ঘিরে রেখেছে।

বনহুরকে সেই পথে যাবার জন্য ইংগিত করলো অস্ত্রধারী লোকগুলো।

বনহুর বিলম্ব না করে ওদের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

অজানা এক দ্বীপে নির্জন পর্বতমালার গহ্বরে এমন ধরনের রহস্যময় বেড়াজাল রয়েছে তা ভাবতেও পারে না বনহুর।

এরা কারা?

যারা ডুবো জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে গহ্বরে বিচরণ করে ফিরছে।

আর পর্বতমালার তলদেশে এরাই বা কারা।

সমুদ্রগর্ভে যে ডুবোজাহাজখানাকে বনহুর দেখছে তাদের সঙ্গে এদের কোনো যোগাযোগ আছে কি না?

প্লেনে যারা এলো আবার চলে গেলো তারাই বা কারা। এসব নিয়ে বনহুর ভাবছে, যদিও তার চিন্তা করবার সময় এটা নয় তবু মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে তার।

বনহুর সেই নতুন গুহামুখ দিয়ে অস্ত্রধারীদের সঙ্গে এগিয়ে চলল। লোকগুলোর পোশাক যেমন বিস্ময়কর তেমনি বিস্ময়কর তাদের চালচলন।

অবাক হয়ে গেছে বনহুর।

তবু নীরবে এগিয়ে যাচ্ছে।

কেমন যেন এলোমেলো লাগছে সব।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর সে।

বনহুর একবার ভাবলো এদের কাবু করে সরে পড়বে কি না। কিন্তু ওদের হাতের অস্ত্রগুলো তার পরিচিত অস্ত্র নয় তাই একটু বিভ্রান্ত হলো।

দেখা যাক ভাগ্যে কি ঘটে।

বনহুর লোকগুলোর সঙ্গে চলেছে।

একটা সুড়ঙ্গপথ।

তেমন কোনো আশ্চর্যজনক কিছু নয়। বনহুরের সম্মুখে তিনজন পেছনে দুজন।

বনহুর গুণে করে দেখে নিলো একবার।

নিজের পকেটে হাত রেখে তার ক্ষুদে মারাত্মক পিস্তলখানা অনুভব করে নিলো। শব্দহীন লক্ষ্যভেদ পিস্তল সেটা তার। বনহুর জানে সে পিস্তল থেকে কেউ রক্ষা পেতে পারে না। পিস্তলখানা তার অসময়ের বন্ধু বলা যায়।

সুড়ঙ্গপথ ধরে অনেক দূর এসে পড়লো।

সম্মুখে একটা প্রশস্ত গুহা।

গুহার মধ্যে অদ্ভুত ধরনের মূর্তি।

মূর্তিগুলোর চোখ দুটো যেন জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে। বনহুর এমন ধরনের মূর্তি দেখেনি কোনোদিন।

সম্মুখে তাকিয়ে আরও অবাক হলো।

দেখলো একটা বিরাট আকার চেয়ারে বসে আছে সেই পিপে মহারাজ। তবে সেই পিপে মহারাজ কিনা তা সে জানে না কিন্তু অবিকল তেমনি মূর্তি।

বনহুরকে দেখামাত্র পিপে মহারাজ দুলে উঠলো।

চেয়ারখানা নড়ে উঠলো কাপুনি দিয়ে।

পিপেরাজ এবার অট্টহাসি হেসে উঠলো।

বনহুর বুঝতে পারলো এতক্ষণ বিভিন্ন স্থানে যে অট্টহাসির শব্দ তার কানে এসে পৌঁছেছিলো তা এই পিপে মহারাজের কণ্ঠের আওয়াজ।

বনহুর পিস্তলখানায় আর একবার হাত বুলিয়ে নিলো।

অস্ত্রধারীরা তখনও ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর তার পাশে দন্ডায়মান অস্ত্রধারীকে লক্ষ্য করে হঠাৎ এক প্রচন্ড ঘুষি মারলো এবং এক ঝটকায় কেড়ে নিলো তার হাতের বিস্ময়কর অস্ত্রখানা।

পিপে রাজ হেসেই চলেছে।

ভীষণ সে অট্টহাসি।

বনহুর পকেট থেকে পিস্তল বের করতে যাবে, অমনি বিস্ময়কর অস্ত্রধারীরা বনহুকে ধরে ফেললো।

বনহুর এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলো নিজকে এবং প্রচন্ডভাবে ঘুষি চালালো। আশ্চর্য, ঘুষি খেয়ে অস্ত্রধারীরা এক একজন পড়ে গেলো মেঝেতে।

বনহুর দেখলো মেঝেতে পড়লো তারা আর উঠে দাঁড়ালো না। তবে কি ওরা প্রাণহীন, যান্ত্রিক মানুষ? সম্মুখে পিপে মানুষটা তখনও হেসে চলেছে।

অট্টহাসি।

বনহুর পিপে মানুষটাকে লক্ষ্য করে তার পিস্তল বের করে গুলী করলো।

সঙ্গে সঙ্গে পিপে মানুষটা গড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু একি, কোনো শব্দ পর্যন্ত হলো না বা এতটুকু রক্ত বেরিয়ে এলো না।

অট্টহাসি থেমে গেলো।

বনহুর ছুটে গিয়ে পিপে মানুষটার মুখের অবরণ খুলে ফেললো। স্পষ্ট দেখতে পেলো কোনো একটা যান্ত্রিক মুখ এবং ভিতরে সাউন্ডবক্স।

এতক্ষণে সবকিছু আন্দাজ করে নিলো বনহুর যারা তাকে আক্রমণ করেছিলো তারা সত্যিকারের মানুষ নয় এবং এতক্ষণ যে অট্টহাসি শুনে আসছে তা এই পিপে মানুষটার কণ্ঠের আওয়াজ নয়। অত্যন্ত সুচতুর কোনো দল আত্মগোপন করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

নিশ্চয়ই সেই দল তার কার্যকলাপ সব দেখেছে এবং সেইভাবে তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা কারা?

বনহুর মেঝেতে পড়া যন্ত্রচালিত মানুষগুলোকে পদাঘাত করে তাদের দেহের বর্ম খুলে ফেললো। একজনের দেহ থেকে খুলে নিলো তার বর্ম।

বনহুর সেই বর্ম পরে নিলো।

তারপর সম্মুখে এগিয়ে চললো।

কিন্তু কয়েক পা এগুতে না এগুতেই মূর্তিগুলো হেসে উঠলো একসঙ্গে, যেন যাদুপুরীর রহস্যময় কান্ড।

বনহুর তাকালো মূর্তিগুলোর দিকে।

মূর্তিগুলোর চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। দাঁত বের করে হাসছে ওরা।

বনহুর মোটেই ঘাবড়ে গেলো না।

সে দ্রুত সেই গুহা থেকে বেরিয়ে পাশের গুহায় প্রবেশ করলো। ঐ মুহূর্তে দুজন লোক উদ্যত রাইফেল হাতে সেই গুহায় এগিয়ে এলো।

বনহুর দেখলো ঐ গুহায় তার দেহে এখন যে পোশাক রয়েছে ঐ ধরনের পোশাকপরা বেশ কিছু যান্ত্রিক মানুষ দন্ডায়মান।

এই প্রথম জীবিত মানুষ বনহুরের নজরে পড়লো। সে দ্রুত যান্ত্রিক মানুষগুলোর সারিতে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং লক্ষ্য করতে লাগলো কি করে লোক দুজন।

লোক দুজন যে বনহুরকে সন্ধান করে ফিরছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর তার পূর্বেই নিজের পরিধেয় বস্ত্রের উপর পরে নিয়েছে যান্ত্রিক মানুষগুলোর পরিধেয় খোলস, তাই যান্ত্রিক মানুষগুলোর সারিতে দাঁড়িয়ে পড়ায় বনহুরকে সহসা চিনে নিতে পারলো না তারা।

ঠিক যান্ত্রিক মানুষের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বনহুর। তাকে কেউ চিনতে পারবে না ঐ মুহূর্তে, কারণ তার মুখমন্ডল আচ্ছাদিত রয়েছে যান্ত্রিক মানুষগুলোর মুখোশ আবরণে।

লোক দুজনের চেহারা বনহুর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তাদের চেহারা নিগ্রো জাতীয় এবং ভয়ংকর হিংস্র বলেই মনে হচ্ছে। বনহুর দেখলো তাদের হাতে এক একটা সরকি জাতীয় অস্ত্র। সুরকির আগায় সূতীক্ষ্ণ ধারালো লৌহশলাকা। গুহার স্বল্প আলোতে বেশ স্পষ্ট নজরে পড়ছে সবকিছু।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তোক দুজনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। তারা চলে গেলো পাশের গুহায়, সেখানে সূতীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা করে দেখলো সবকিছু।

হয়তো বা আগন্তুকটাকেই তারা খুঁজে ফিরছে। বেশ কিছুক্ষণ পাশের গুহার সন্ধান করার পর। ফিরে এলো তারা এ গুহায়। যান্ত্রিক মানুষগুলোর মধ্যে খুঁজলো ভালভাবে।

বনহুর বুঝতে পেরে নিখুঁতভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ঠিক যেমনটি করে গোছানো আছে যান্ত্রিক মানুষগুলো।

লোকগুলো বেরিয়ে গেলো। যাবার পূর্বমুহূর্তে একটা হ্যান্ডেল ঘোরালো, সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক মানুষগুলো চলতে শুরু করলো।

ভীষণ এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

তবু বনহুর ঘাবড়ালো না, সেও ঠিক যান্ত্রিক মানুষগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলো।

সবগুলো নয় মাত্র কয়েকজনকে সঙ্গী করে নিয়ে চললো ওরা। সেই গুহা থেকে বেরিয়ে চলছে, অদ্ভুতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে যেন এক একটা সত্যিকারের মানুষ।

বনহুরও কম নয়, সেও যান্ত্রিক মানুষগুলোর মত কাজ করছে।

সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

লম্বা একটা সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক মানুষগুলো।

যে লোক দুজন হ্যাঁণ্ডেল জাতীয় মেশিন ঘোরাচ্ছিলো তারা তখনও সেই গুহায় হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে। তবে বনহুর এখন তাদের দেখতে পাচ্ছে না। তবু সে আন্দাজে বুঝে নিলো বা বুঝতে পারলো।

বনহুর বেশ ক্ষুধা অনুভব করছে।

যান্ত্রিক মানুষগুলোর পেটেতে ক্ষুধা নেই তাই তারা নিঃশব্দে এগুচ্ছে।

হঠাৎ থেমে গেলো যান্ত্রিক মানুষগুলো।

এবার বনহুর দেখতে লাগলো, যান্ত্রিক মানুষগুলো যেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে সেখানে প্রশস্ত জায়গা এবং চারপাশে নানা রকম যান্ত্রিক কলকারখানা।

বনহুর ভীষণ অবাক হলো।

একটা জনপ্রাণহীন দ্বীপের পর্বতমালার অতল গহ্বরে এমন সব মেশিনারী কলকারখানা রয়েছে সত্যি ভাবতে অবাক লাগে। বনহুর তার যান্ত্রিক বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মেশিনগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক ব্যক্তি তার দেহে তেল কালি মাখা পোশাক। পাশের টেবিলে কিছু পাউরুটি আর মাখনও এক সোরাহি পানি। লোকটা বোধ হয় খাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো কিন্তু ঐ মুহূর্তে খাওয়া আর হলো না! যান্ত্রিক মানুষগুলোর আগমনে লোকটা ব্যস্তসমস্ত হয়ে প্রথম যান্ত্রিক মানুষটার পাশে এগিয়ে এলো এবং তার পিঠের সুইচে চাপ দিতেই যান্ত্রিক মানুষটা বেশ হাঁটতে শুরু করলো এবং এগিয়ে গেলো একটা মেশিনের পাশে।

তেলমাখা পোশাক পরিহিত লোকটা মাথার ক্যাপটা খুলে রেখে একটা রবারের পাইপ পরিয়ে দিলো যান্ত্রিক এক নম্বর মানুষটার পিঠের সঙ্গে।

তারপর সুইচ টিপলো।

সাঁ সাঁ আওয়াজ হলো, মনে হলো কিছুটা গ্যাস ঐ যান্ত্রিক মানুষটার দেহে প্রবেশ করলো।

বনহুরের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেলো, যান্ত্রিক মানুষগুলো তাহলে গ্যাসের দ্বারা চালিত হয়। গ্যাস হলো যান্ত্রিক মানুষগুলোর খাদ্য।

লোকটা একটার পর একটা যান্ত্রিক মানুষকে টেনে নিয়ে গ্যাস ভক্ষণ করাচ্ছিলো। পাঁচ নম্বরে গিয়ে তার পালা।

বনহুর প্রস্তুত হয়ে নিলো।

যেমনি লোকটা তার পাশে এসে দাঁড়ালো অমনি সে দুহাতে টিপে ধরলো লোকটার গলা। খুব চেপে ধরলো যেন কোনো আওয়াজ তার মুখ দিয়ে না বের হয়। যান্ত্রিক মানুষের লৌহবর্মপরা হাতের মুঠির কঠিন চাপ লোকটা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো।

বনহুর ওকে নিক্ষেপ করলো মেঝেতে।

তাড়াতাড়ি করে বনহুর এবার ওপাশে টেবিল আকার পাথরটার উপরে রক্ষিত খাদ্যগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো। গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যে মাখন আর পাউরুটি শেষ করে সোরাহি ধরনের পানির পাত্রটা তুলে নিলো, তারপর ঢকঢক করে পানি পান করতে লাগলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে এক তরুণী সেই গুহায় প্রবেশ করে যান্ত্রিক মানুষটাকে আশ্চর্যজনকভাবে পানির পাত্র হতে পানি পান করতে দেখে চিৎকার করে উঠলো।

বনহুর বুঝতে পারলো তরুণী তাকে সত্যিই যান্ত্রিক মানুষ মনে করে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। বনহুর ইচ্ছা করেই মাটির পানির পাত্রটি হাত থেকে ফেলে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেলে পানির পাত্রটা।

তরুণী চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর বুঝতে পারলো আর এই পোশাকে আত্মগোপন চলবে না। কারণ এক্ষুণি অন্য কেউ এসে তাকে খুঁজে বের করবে।

বনহুর দ্রুতহস্তে পোশাকখানা খুলে পরিয়ে দিলো সেই সংজ্ঞাহীন লোকটার দেহে। খুব কষ্ট হলো যদিও তবু বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করলো।

সংজ্ঞাহীন লোকটার দেহে যান্ত্রিক লোকগুলোর পরিচ্ছদ পরিয়ে দিয়ে নিজে আড়ালে আত্মগোপন করে ফেললো। ততক্ষণে তিনজন বলিষ্ঠ পুরুষ এবং সেই তরুণী যে বনহুরকে সোরাহির পানি পান করতে দেখে ভীতভাবে চিৎকার করে পালিয়ে গিয়েছিলো, মনে করেছিলো। যান্ত্রিক মানুষটা কিভাবে পানি পান করছে।

তরুণী এসেই আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যে স্থানে বনহুর দাঁড়িয়ে পাউরুটি আর পানি পান করেছিলো। কিন্তু সেখানে কাউকে না দেখে যান্ত্রিকমানুষগুলোর দিকে এগিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে নজর পড়লো নিচে মেঝেতে পড়ে আছে একটা যান্ত্রিক মানুষ।

তিনজন লোক এবং তরুণী যান্ত্রিক মানুষ মনে করে যেমন মেঝেতে পড়া লোকটাকে তুলে দাঁড় করাতে গেলো অমনি তারা বুঝতে পারলো সেটা সত্যি যান্ত্রিক মানুষ নয় আসলে তাদেরই লোক।

লোকটা সংজ্ঞাহীন, তাহলে খেলে কি করে?

তরুণী বললো–আমি নিজে তাকে সোরাহিসহ পানি পান করতে দেখেছি।

বনহুর যদিও তাদের কথা বুঝতে পারছিলো না তবু আন্দাজে বুঝে নিলো সব কিছু। তরুণী তার সঙ্গীদের বলছে এই ব্যক্তিকে সে নিজের চোখে খেতে দেখেছে তারপর সে কেমন করে সংজ্ঞা হারালো তা জানে না।

তরুণীর সঙ্গী তিনজন তার কথা মেনে নিলো এবং সংজ্ঞাহীন লোকটার দেহ থেকে লৌহবর্ম খুলে দিয়ে তাকে বলে নিয়ে চলে গেলো।

বনহুর এবার ফলো করলো লোকগুলোকে।

সুড়ঙ্গপথ ধরে ওরা চলেছে।

বনহুর অতি সাবধানে এগুচ্ছে। তাকে যেন দেখে না ফেলে এদিকে রয়েছে তার সতর্কদৃষ্টি।

একি, ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে সুড়ঙ্গপথটা।

সংজ্ঞাহীন লোকটাকে বয়ে নিয়ে চলেছে ওরা।

দুপাশে পাথুরে দেয়াল।

মাথার উপরেও পাথর, একটুও নজরে পড়ছে না কিছু। শুধু জমাট অন্ধকার মনে হচ্ছে।

এবার ভীষণ একটা গর্জন কানে আসছে বনহুরের। ঠিক সমুদ্রের গর্জন বলে মনে হচ্ছে। তবে কি এই সুড়ঙ্গপথ সমুদ্রের তলদেশে এসে পড়েছে? কি ভয়ংকর মহাচক্র বনহুর ভাবছে আর এগুচ্ছে।

ওরা তিনজন এবং তরুণী সোজা এগুচ্ছে দ্রুতগতিতে।

সুড়ঙ্গপথ ঝাপসা অন্ধকার হলেও ওদের পথ চলতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

এবার আলোকরশ্মি ভরা একটা প্রশস্ত কক্ষ।

ঠিক পিপে মানুষটার মত একজন বসে আছে। তার পাশে নানা ধরনের মেশিন এবং কলকজা রয়েছে তার সামনে। পিপে মানুষটার চোখ দুটো দপ দপ্ করে জ্বলছে যেন।

বনহুর সেই প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো না। সে আত্মগোপন করে এতদূর এসেছে কিন্তু আর এগুনো তার পক্ষে তখনকার জন্য মোটেই উচিত নয়।

একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে সব লক্ষ্য করে চললো।

তরুণী ও তার সঙ্গীত্রয় সেই মেশিনযুক্ত অদ্ভুত প্রশস্ত কক্ষটার মধ্যে প্রবেশ করতেই পিপে মানুষটা কর্কশ কণ্ঠে ইংরেজিতে বললো–ওর অবস্থা এ রকম কেন?

তরুণী ইংরেজিতে জবাব দিলো।

বনহুর বুঝতে পারলো পিপে মানুষটা আসলে জীব নয় সে মানুষ কিন্তু বনহুরের মনে পড়লো সর্পরাজের সঙ্গে পিপেরাজের যুদ্ধের কথা। তারপর মনে পড়লো সেই ভীষণ বালুকারাশির মধ্যে অদ্ভুতভাবে পিপে জীবগুলোর ডিম থেকে বাচ্চার উদ্ভব। সব দৃশ্যগুলো ভাসতে লাগলো বনহুরের চোখের সামনে।

কিন্তু আশ্চর্য, পিপে জীবগুলোতো মানুষ নয়, সে কথা বলবে কি করে। এতসুন্দর ভাষায় স্পষ্ট ইংরেজি কথা, না এ ক খনও? হতে পারে না। তবে কি পিপে জীবগুলো কথা বলতে পারে। হয়তো শেখালে পারে কিন্তু বিশ্বাস হয় না বনহুরের।

পিপে জীবটার খোলসে নিশ্চয়ই পূর্বের মত কোনো যান্ত্রিক কলকজা আছে কিন্তু আশ্চর্য, যান্ত্রিক বস্তুর চোখগুলো অমন জীবন্ত হবে কি করে?

বনহুর ভাবছে।

তরুণী আর তার সঙ্গীত্রয় সংজ্ঞাহীন লোকটাকে নিয়ে চলে গেলো ওদিকে।

তখন বনহুর তাদেরকে ফলো না করে আড়ালে রয়ে গেলো এবং পিপে মানুষটার কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলো।

ওরা তিনজন চলে যেতেই পিপে মানুষটা নড়ে উঠলো। তার তলদেশ থেকে বেরিয়ে এলো দুখানা পা। একেবারে ভারী বুট পরা দুখানা পা।

হাঁটছে পিপে মানুষটা।

এবার তার দেহ থেকে দুখানা হাত বেরিয়ে এলো।

বনহুরের বিস্ময় বাড়ছে।

সে আরও ভালভাবে লক্ষ্য করছে।

পিপে জীবগুলো তো গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। তাদের পা এবং হাত কিছুই নেই কিন্তু এ আবার কেমন ধরনের জীব। পা–হাত সব আছে, পিপে জীবটা আসন থেকে নেমে সোজা একটা মেশিনের দিকে এগিয়ে গেলো।

বনহুর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সব দেখছে।

পিপে লোকটার মাথাও বেরিয়ে পড়লো কাঁধের ভেতর থেকে।

আশ্চর্য বটে।

কিন্তু মাথা আর মুখ কভারে ঢাকা।

বনহুর পিপে জীবটার খোলসে একজনকে আত্মগোপন করে থাকতে দেখে অবাক হলো। লোকটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই ব্যক্তি কে?

সুইচ টিপলো পিপে মানুষটা।

সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে বড় একটা টেলিভিশন পর্দা ভেসে উঠলো, সেই টেলিভিশন পর্দায় ভেসে উঠলো আশ্চর্য সব দৃশ্য।

দেখা যাচ্ছে তিনজন লোক এবং সেই তরুণী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সেই লোককে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা টেবিলে সংজ্ঞাহীন লোকটাকে শুইয়ে দিলো ওরা। তারপর লোকটার শরীর থেকে আবরণ বা তার তেলকালি মাখা পোশাক খুলে ফেললো।

এমন সময় একজন লোক হাজির হলো। তার মুখে মাক্স বাধা, হাতে এক ধরনের পাইপ আছে বলে মনে হচ্ছে।

পিপে মানুষটা সুইচ অন করে দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, তার মুখমন্ডল দেখা যাচ্ছিলো না, দেখা গেলে তার মুখোভাবে অনেক কিছু বুঝে নিতে বনহুর।

লোক তিনজন সংজ্ঞাহীন লোকটার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। নাকের মধ্যে এক ধরনের পাইপ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার নিঃশ্বাসকে সজীব করার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা চালাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এলো লোকটার।

টেবিলে উঠে বসলো এবং নিজের মাথায় বারবার ঝাঁকুনি দিচ্ছিলো।

সব লক্ষ্য করছে সেই পিপে মানুষটা।

বনহুর বুঝতে পারে পিপে মানুষটার দেহের আবরণ সত্যিকারের আবরণ নয়। আসলে পিপের মধ্যে আছে একটা আসল মানবদেহ এবং সেই ব্যক্তিই এদের দলপতি।

লোকটা পিঁপে জীবের অন্তরালে নিজকে আড়াল করে রেখে কাজ করছে।

পিপে মানুষটা তার সম্মুখস্থ টেলিভিশন পর্দায় তাকিয়ে কিছু উচ্চারণ করলো। তখন দেখা গেলো টেবিলে বসা সেই সংজ্ঞা ফিরে পাওয়া ব্যক্তি কিছু উচ্চারণ করছে।

পাশে দাঁড়িয়ে তরুণী তা নোট করে নিচ্ছে।

পিপে মানুষটা তার দেহটা নিয়ে দুলে উঠলো, তারপর সুইচ অফ্ করে দিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা এবং মাথা গুটিয়ে ফেললো পিপে দেহটার মধ্যে।

বনহুর সরে গেলে সেখান থেকে।

পেছনে লক্ষ্য করতেই একটা সিঁড়ি তার দৃষ্টিপথে পড়ে গেলো। অত্যন্ত গোপনীয় পথ বলে মনে হচ্ছে বনহুরের কাছে। বনহুর সেই সিঁড়িপথ ধরে উপরে উঠতে লাগলো।

সমুদ্রের গর্জন আরও স্পষ্ট কানে আসছে।

কিছুটা উঠার পর দুপাশে রবারযুক্ত আবরণ এবং একটা কৌশলে নির্মিত চোঙ্গা। সিঁড়িখানা সেই চোঙ্গাপথে অদৃশ্য হয়েছে।

বনহুর কোনো দ্বিধা না করে সেই চোঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করলো। অমনি চোঙ্গাখানা সা সা করে উপরে উঠতে লাগলো।

বনহুর ঝুলন্ত সিঁড়িখানা আঁকড়ে ধরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিঁড়িখানা উপরে উঠে যাচ্ছে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছে বনহুর। চারদিকে অন্ধকার।

মাত্র কয়েক মিনিট।

সিঁড়িখানা তাকে একেবারে এমন জায়গায় এনে পৌঁছে দিলো যেটা সেই ডুবোজাহাজ।

বনহুর দেখলো একটা ক্যাবিনের মধ্যে তাকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ক্যাবিনটার কোনো দরজা–জানালা নজরে পড়ছে না, শুধু চারপাশে দেয়াল এবং দেয়ালে নানা ধরনের বাল্বা আছে। বনহুর মেঝেতে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে একটা লাল বাল্ব জ্বলতে আর নিভতে লাগলো।

বনহুর কিছুটা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখছে, ব্যাপারখানা কি! ঠিক এমন সময় পূর্বের সেই ভারী গলার আওয়াজ। সম্পূর্ণ সাংকেতিক শব্দ।

একি, মেঝেটা তাকে নিয়ে আরও উপরে উঠে যাচ্ছে।

একেবারে জাহাজের স্বাভাবিক ক্যাবিন।

লাইট জ্বলছে।

সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

জাহাজখানা সমুদ্রগর্ভে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যে ক্যাবিনটায় বনহুর এসে দাঁড়ালো তার চারপাশে কয়েকটা কাঁচের আবরণ দেওয়া জানালা। বনহুর তাকালো কাঁচের আবরণ দিয়ে বাইরে। সমুদ্রের তলদেশে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের বিস্ময়কর উদ্ভিদ এবং সামুদ্রিক জলজীব। বিরাট আকার হাঙ্গর সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে, নানা ধরনের মাছ এবং কচ্ছপ দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এ সব দেখবার সময় নেই বনহুরের।

বনহুর ক্যাবিনের মধ্যে দৃষ্টিপাত করলো।

একনজর দেখলে অনেকগুলো প্যাকেট থরে থরে সাজানো আছে। প্যাকেটগুলোতে কোনো মূল্যবান সামগ্রী আছে তাতে কোনো ভুল নেই।

বনহুর প্যাকেটগুলো দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলো। সে বুঝতে পারলো এই প্যাকেটগুলোই প্লেন থেকে নামানো হয়েছিলো।

বনহুর প্যাকেটগুলোর দিকে এগিয়ে যাবে ঠিক ঐ দন্ডে একটা আর্তনাদ শুনতে পেলো। মনে হলে ঐ ক্যাবিনটার ঠিক পাশেই কোন ক্যাবিনে এই আর্তনাদ হলো।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

প্যাকেটগুলো আর দেখা হলো না।

পাশে একটা দরজা কড় কড় করে খুলে গেলো।

বনহুর দ্রুত সেই দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। সে দেখলো একজন লোক মুখে মুখোশ হাতে বিস্ময়কর অস্ত্র নিয়ে সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। ক্যাবিনে প্রবেশ করেই শিষ দিলো সে, অমনি তিন জন লোক তাদের মুখেও মুখোশ প্রবেশ করলো সেই ক্যাবিনে।

প্রথম ব্যক্তি ইংগিত করলো তার সঙ্গী তিনজনকে প্যাকেটগুলো কাঁধে তুলে নেবার জন্য।

তিন ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির নির্দেশমত কাজ করলো।

ওরা তিনজন কাঁধে তুলে নিতেই প্রথম ব্যক্তি সম্মুখের একটা হ্যান্ডেল জাতীয় মেশিন ঘোরাতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা নীলাভ আলো জ্বলে উঠলো ক্যাবিনটার মধ্যে, দেয়ালে ভেসে উঠলো টেলিভিশন পর্দা। আশ্চর্য, ঠিক নিচের ক্যাবিনের মতই টেলিভিশন পর্দাটা।

বনহুর দেখছে পরিষ্কার আকাশ।

মাঝে মাঝে খন্ড খন্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।

প্রথম ব্যক্তি তখনও হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে চলেছে। কয়েক মিনিট টেলিভিশন পর্দায় দেখা গেলো একটা প্লেন উড়ে আসছে।

প্রথম ব্যক্তি নিজের মুখের আবরণ খুলে ফেললো।

বনহুর অবাক হয়ে দেখলো প্রথম ব্যক্তি অন্য কেউ নয় সেই তরুণী। এমনভাবে সে পোশাক পরেছে যে, তাকে পুরুষ ছাড়া কিছু মনে হবে না।

অপর তিন জন যদিও কাঁধে প্যাকেটগুলো বোঝা বেঁধে তুলে নিয়েছে তবু তারা মুখের আবরণ এক একজন খুলে ফেললো।

বনহুর দেখলো তারা ঐ তরুণীর সঙ্গী তিনজন।

সবাই পুনরায় নিজ নিজ মুখের আবরণ ঢেকে ফেললো।

আশ্চর্য ধরনের দেয়াল টেলিভিশনের পর্দায় প্লেনখানা স্পষ্ট হতে আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ব্যস্ত হয়ে উঠলো ওরা চারজন।

ওদের ব্যস্ততা লক্ষ্য করে মনে হলো কোনো কুকর্ম সাধন শেষে পালিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। এই ক্যাবিনে অন্য কেউ আত্মগোপন করে তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে এ কথা ভাবতেও পারেনি তারা।

প্লেনখানা প্রায় এসে গেছে।

পুরুষ বেশধারী তরুণীটি হ্যান্ডেল জাতীয় মেশিনটা অপরদিকে ঘুরিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে সেই বিস্ময়কর টেলিভিশন পর্দা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বনহুর বুঝতে পারলো প্লেনখানা তাদের জাহাজের ঠিক উপরে এসে গেছে। তরুণী আর একটা হ্যান্ডেল ঘোরাতে শুরু করলো।

এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জাহাজখানা ভেসে উঠছে উপরের দিকে। শব্দ হচ্ছে ঝক ঝক ঝক

বনহুর স্তব্দ্ধ নিঃশ্বাসে লক্ষ্য করছে সবকিছু।

কিছুক্ষণ বনহুর সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

ওরা কিছু পরামর্শ করে নিলো নিজেদের মধ্যে।

বনহুরের বুঝতে বাকি রইলো না ওরা তাদের মালিক বা দলপতিকে হত্যা করে পালিয়ে যাচ্ছে অথবা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে।

তরুণী এবং ওরা তিনজন প্যাকেটগুলো গুছিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়েছে।

এবার বেরিয়ে গেলো ওরা।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাদের পেছনেই বেরিয়ে এলো, সবার পেছনে যে আসছিলো বনহুর আচমকা তাকে টেনে নিলো আড়ালে এবং সে টু শব্দ করবার পূর্বেই মুখে রুমাল খুঁজে দিলো ভালভাবে।

এবার বনহুর লোকটার পোশাক খুলে নিলো এবং নিজে পরে নিলো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। তারপর ওর কাঁধের প্যাকেটগুলো নিজের কাঁধে তুলে নেবার পূর্বে একটা প্যাকেট খুলে দেখে নিলো। দেখলো প্যাকেটগুলোর মধ্যে রয়েছে অতিমূল্যবান পাথরযুক্ত বলয়। মাত্র এক সেকেন্ড দেখে নিলো তারপর বনহুর মুখোশ দিয়ে নিজের মুখমন্ডল আচ্ছাদন করে নিলো এবং কাঁধে প্যাকেটগুলো তুলে নিয়ে ওদের দলে এসে যোগ দিলো।

বনহুর হঠাৎ হোঁচট খেলো মেঝেতে পড়া একটা বস্তুর সঙ্গে। দেখলো বস্তুটি অন্য কিছু নয় সেই পিপে মানুষটি। যার হাত, পা, মুখ এবং মাথা দেহের মধ্য হতে বেরিয়ে এসেছিলো এবং হাত দিয়ে হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছিলো অতি সতর্কতার সঙ্গে।

বনহুর বুঝতে পারলো এই পিপে মানুষটাই ছিলো তাদের দলপতি। আসলে সে সত্যিকারের পিপে মানুষ নয়, সে সাধারণ মানুষ কিন্তু পিপে জাতীয় খোলসের মধ্যে নিজকে গোপন রাখতে। নিজদের লোকের কাছেও নিজকে প্রকাশ করেনি।

একদিন নিজ দলের মানুষগুলোই হলো তার শত্রু। যারা তার দলে যোগ দিয়ে কাজ করতো। তারা দেখলো কোটি কোটি টাকার সামগ্রী তারা বাইরে পাচার করে দিচ্ছে তার পরিবর্তে আসছে প্রচুর অর্থ কিন্তু সে অর্থে তাদের কোনো স্বত্ব নেই, তারা সে অর্থে কোনোদিন ভাগ বসাতে পারবে না। তাই দলের লোক

দলপতিকে হত্যা করে বলয়–এর প্যাকেটগুলো নিয়ে বিমানযোগে পালানোর মতলব করেছে।

বনহুর দপতির মৃতদেহটার দিকে একবার দেখে নিয়ে এসে হাজির হলো সঙ্গীদের সারিতে।

ডুবোজাহাজখানা সম্পূর্ণ ভেসে উঠেছে।

আস্তে আস্তে ঢাকনাটা খুলে যাচ্ছে।

সঙ্গীরা বনহুরকে মোটেই সন্দেহ করতে পারে না, কারণ তার দেহে যে পোশাক ছিলো তা তাদেরই তিনজনের একজনের। কাজেই বনহুর কতকটা নিশ্চিন্তভাবেই কাজ করে যাচ্ছে।

প্লেনখানা নেমে এলো জাহাজটার উপরে, সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হলো। তিনজনসহ তরুণী দ্রুত প্যাকেটগুলো বহন করে প্লেনে উঠে পড়লো।

ক্ষিপ্রগতিতে কাজ হচ্ছে।

ওরা চারজন প্লেনে চেপে বসতেই প্লেখানা আকাশে উড়ে উঠলো।

আকাশে প্লেনখানা ভেসে উঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড বিস্ফোরণ হলো, ডুবোজাহাজখানা ভাসমান অবস্থায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে পর্বতমালাগুলো ধসে পড়ছে চারপাশে।

বনহুর বুঝতে পারলো তরুণী শুধু সম্পদ নিয়েই পালাচ্ছে না, সে সমূলে সব কিছু ধ্বংস করে দিয়ে সরে পড়ছে।

বনহুর প্লেন থেকেই নিচের এ দৃশ্য দেখলো। নিজের অজ্ঞাতে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলোমস্কো দ্বীপের মহাচক্রের পরিসমাপ্তি ঘটলো। কিন্তু এই চক্রীদলকে এমন সহজভাবে পালিয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

বিমানখানা যখন আকাশপথে সমুদ্র অতিক্রম করছিলো তখন বনহুর নিশ্চুপ থাকতে পারলো না। সে দ্রুত আসন ত্যাগ করলো এবং বিমান চালকের বুক লক্ষ্য করে তার ক্ষুদে পিস্তল উঁচু করে ধরলো।

বিমান চালক হতভম্ব হয়ে পড়লো।

তরুণী এবং তার অপর সঙ্গী দুজন মনে করলো তাদের একজন সব ছিনিয়ে নেবার জন্য চক্রান্ত চালাচ্ছে।

তরুণী ও অপর দুজন হকচকিয়ে গেলো।

আশ্চর্য হলো একজন সঙ্গী তাদের বিদ্রোহী হয়েছে বলে।

বনহুরকে ওরা আক্রমণ করলো পেছন থেকে।

বিমানে শুরু হলো মল্লযুদ্ধ।

বনহুর তার ক্ষুদে পিস্তলখানা ব্যবহার করলো। প্রথম গুলী গিয়ে বিদ্ধ হলো একজন চক্রীর পাজরে। সঙ্গে সঙ্গে উবু হয়ে পড়ে গেলো সে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো বিমানের মেঝেটা।

বনহুরকে এবার আক্রমণ করলো দ্বিতীয় জন্য।

বনহুরের পিস্তলের একটা গুলী তাকেও পরপারে পাঠিয়ে দিলো।

এবার তরুণী।

সে তার কঠিন অস্ত্র নিয়ে বনহুরকে আক্রমণ করলো।

বনহুর জানে তরুণীর হাতের অস্ত্রখানা মারাত্মক। তাই সে কৌশলে তরুণীকে পেছন থেকে ধরে ফেললো।

বনহুরের শক্তির কাছে তরুণীর দেহবল ক্ষীণ।

কাজেই সে কাবু হয়ে পড়লো মুহূর্তে।

আশ্চর্য হলো তরুণী, তার দলের মধ্যে এমন শক্তিশালী ব্যক্তিও ছিলো যে তাকে কাবু করতে পারে। তরুণী বললো–মাংকু, তুমি আমাকেও পরাজিত করলে?

বনহুর বুঝে নিলো সে যার পোশাক পরে নিয়েছে তার নাম মাংকু।

বনহুর নিজের ক্ষুদে পিস্তলখানা পূর্বেই পকেটে রেখে দিয়েছিলো। এবার সে তরুণীকে মুক্তি দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

তরুণীর মুখের আবরণ খুলে ফেললো বনহুর একটানে, তারপর বললো– খবরদার, যদি কোনো রকম গোলযোগ সৃষ্টি করেছো তাহলে আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

বনহুরের গলা তরুণী নতুন শুনলো।

অবশ্য কথাবার্তা ইংরাজিতে হচ্ছিলো।

এই আবরণের নিচে যে তাদের লোক নয় অপর কেউ রয়েছে তা বুঝতে পারলো তরুণী, সে বলে উঠলো–কে তুমি!

বনহুর বললো–তোমাদের বন্ধু।

তরুণী আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো এবং চিৎকার করে বললো–পাইলট, তুমি আমাদের ঘাটিতে জানিয়ে দাও আমরা বিপদগ্রস্ত এবং আমাদের বিমানে শত্রু আসছে। তারা যেন প্রস্তুত থাকে…

পাইলট তরুণীর কথামত যেমনি ওয়্যারলেসে তার কথাগুলো জানাতে গেলো অমনি উঁচু করে ধরলো– খবরদার, শব্দ যদি উচ্চারণ করো বা তোমাদের ঘাটিতে জানাও তাহলে এক্ষুণি এই ভয়ংকর পিস্তলখানার একটা গুলী তোমার কণ্ঠ চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেবে।

পাইলট নিশ্চুপ রইলো।

মৃত্যুভয় কার না আছে।

তরুণীর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। যেন দাঁতে দাঁত পিষে বললো– শত্রু, তোমাকেও আমি দেখে নিচ্ছি…কথাটা বলে সে বিমানের মেঝে থেকে হাত থেকে তার খসে পড়া মারাত্মক অস্ত্রখানা তুলে নিতে গেলো।

বনহুর টেন পেয়ে দ্রুত পা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বিমানের পেছন অংশে।

তরুণী হতবুদ্ধি হলো না। ভীষণ চালাক সে, বিমানের মেঝের এক অংশে পা দিয়ে চাপ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে বিমানের তলদেশ ফাঁক হয়ে গেলো।

বনহুর নিচে পড়ে গেলো।

বনহুর বিমানের তলদেশ দিয়ে শূন্যে পতিত হলো।

নিচে গভীর সমুদ্রতরঙ্গ।

বনহুর পড়ে গেলো সমুদ্রগর্ভে।

*

জাভেদ কান্দাই আস্তানায় এসে পড়লো।

অশ্বপদশব্দ শোনামাত্র রহমান কায়েস এবং আরও কয়েকজন অনুচর তাকে ঘিরে ধরলো।

অশ্বলাগাম ধরলো রহমান তার ডান হাত দিয়ে।

নেমে দাঁড়ালো জাভেদ।

কুর্ণিশ জানালো অন্যান্য অনুচর।

জাভেদ তার পিতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। সৌন্দর্যে শক্তিতে এবং বুদ্ধিবলে। চোখ দিয়ে আগুন টিকরে বের হচ্ছে।

জাভেদ অশ্ব থেকে নেমে আস্তানায় ভিতরে প্রবেশ করলো।

কেউ তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার সাহস পেলো না।

রহমান অপর এক অনুচরকে অশ্ব আস্তাবলে বেঁধে রাখার জন্য বললো।

রহমানের আদেশ পালন করলো অনুচরটা।

অন্যান্য অনুচর একটু ভীত আতঙ্কিত হলো। কারণ জাভেদকে আজ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একটা হিংস্র ভাব।

এমন কি রহমান নিজেও সাহসী হলো না তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার।

জাভেদ আস্তানায় প্রবেশ করলো।

তাকে অনুসরণ করলো রহমান এবং কায়েস।

জাভেদের আগমন সংবাদ পেয়ে ছুটে এলো নূরী। জাভেদ আস্তানায় এসেছে এটা তার বড়। খুশির সংবাদ। হাজার হলেও পুত্র–দরদ জননীর কাছে সীমাহীন।

জাভেদ সোজা দরবারকক্ষে গিয়ে হাজির হলো।

ছুটে এলো অন্যান্য অনুচর।

নূরীও এলো।

পুত্রকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখে বিচলিত হলো নূরী। পুত্রের পাশে এসে বললো– জাভেদ, কি সংবাদ?

জাভেদ হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে ফেলে বললো–জাম্বুরীরা আশা আম্মুকে পাকড়াও করে নিয়ে গেছে।

মুহূর্তে নূরীর মুখমন্ডল রাঙা হয়ে উঠলো, সে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো–জাম্বুরীরা আশাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেছে, বলিস কি জাভেদ

হাঁ, সত্যি যা তাই বলছি। বললো জাভেদ।

নূরী আর জাভেদের কথাগুলো রহমানের কানে যেতেই তার মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো।

রহমান জানে জাভেদ আশাকে কতখানি শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। তাছাড়া আশা বহুবার নানাভাবে সর্দারের জীবন রক্ষা করেছে। আজ সেই আশা বিপদগ্রস্ত....

রহমানও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

জাভেদ অনুচরদের উদ্দেশ্য করে বললো–তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও, জাম্বুরীদের সঙ্গে লড়াই হবে।

নূরী বললো–জাভেদ, তুমি জানোনা জাম্বুরীরা কত ভয়ংকর।

জানি কিন্তু জেনে রেখো আম্মু জাম্বুরীদের কাবু করে আমি আশা আম্মুকে উদ্ধার করবোই।

বেশ, আমি নিজেও তোমাকে সহায়তা করবো। বললো নূরী।

জাভেদ খুশি হলো।

নূরী অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো–যাও তোমরা এক্ষুণি তৈরি হয়ে নাও নিজ–নিজ অস্ত্র এবং অশ্ব নিয়ে।

নূরীর নির্দেশ পাওয়ামাত্র অনুচরগণ হর্ষধ্বনি করে বললো–আমরা প্রস্তুত হতে যাচ্ছি।

সবাই বেরিয়ে গেলো।

নুরী জাভেদসহ ফিরে এলো আস্তানার অভ্যন্তরে।

জাভেদ পায়চারী করছে।

এমন সময় ফুল্লরা দৌড়ে এসে থমকে দাঁড়ালো। জাভেদকে দেখে খুশিতে উচ্ছল হয়ে বললো–তুমি এসেছো জাভেদ–আঃ আমি যা খুশি হয়েছি।

জাভেদ ওর কথায় কান না দিয়ে বললো–না জানি আশা আম্মুকে ওরা কতদূর পাকড়াও করে নিয়ে গেছে? না জানি এখন সে কেমন আছে...

ফুল্লরা রাগতভাবে বললো, জাভেদ–তুমি কতদিন পর এলে আর আমার সঙ্গে কথাই বলছো না? যাও আমিও তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।

জাভেদ বললো–তাতে আমার বয়েই যাবে।

কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়ছি না।

কেন?

তুমি আমাদের এখানে থাকবে। জানো জাভেদ, নূরী আম্মু তোমার জন্য কত দুঃখ করে।

জানি তবু কোনো উপায় নেই। তারপর আপন মনেই বলে উঠে জাভেদ–আশা আম্মু আমাকে তোমাদের চেয়ে অনেক ভালবাসে।

ফুল্লরা বলে উঠে–নূরী আম্মুর চেয়েও আশা আম্মু তোমাকে

হাঁ।

না, তুমি ভুল করছে জাভেদ।

আমি অবুঝ শিশু নই ফুল্লরা। যাও এখন তুমি বিরক্ত করো না।

বিরক্ত আমি করবোই।

কারণ?

কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।

হাঃ হাঃ হাঃ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে জাভেদ।

ফুল্লরার চোখ দুটো ছলছল করে উঠে। শুধু আজ নয়, এমনি আরও অনেক দিন ফুল্লরা জাভেদের কাছে অবহেলা পেয়েছে। নানা রকম কথা বলে তাকে ব্যথা দিয়েছে জাভেদ।

আজও জাভেদ ফুল্লরাকে তেমনিভাবে বিদায় করার চেষ্টা করলো কিন্তু ফুল্লরা চলে গেলো না, বললো–জাভেদ, তুমি দিন দিন বড় নিষ্ঠুর হচ্ছে।

নিষ্ঠুর–কে বললো?

আমি বলছি।

তুমি তো জানোনা আমি কত নিষ্ঠুর। যদি জানতে হবে এমনভাবে আমাকে বিরক্ত করতে আসতে না।

জাভেদ।

আমি তোমাকে বারণ করছি বিরক্ত করো না।

ফুল্লরা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে তারপর ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলো।

এমন সময় সেখানে প্রবেশ করে নূরী, তার দেহে শিকারী ড্রেস, পিঠে রাইফেল বাধা।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে নূরী।

গুহগায় প্রবেশ করতেই ফুল্লরাকে আটকে ফেলল। তার চোখে অশ্রু দেখে বলে উঠে নূরী–কি হলো, ফুল্লরা অমন করে চলে যাচ্ছ কেন?

জাভেদ কোনো কথা না বলে বললো–আম্মু তুমি প্রস্তুত? চলো এবার রওনা দেওয়া যাক।

বললো নূরী–না, আগে জবাব দাও ফুল্লরার সঙ্গে তোমার কি হয়েছে? ওর চোখে পানি কেন?

বললো জাভেদ–আমি কেমন করে বলবো?

ওর চোখে পানি কেন তুই জানিস না জাভেদ

না।

মিথ্যে কথা।

আম্মু, এখন এত কথা বলার সময় নেই, আমাকে যেতে দাও?

আগে বলতে হবে।

আম্মু।

তোর বাপু আমাকে এমনি করে দিয়েছে, আজও সে আমাকে কাঁদাচ্ছে আর তুই

আম্মু তুমি কি বলছে আমি মোটেই বুঝতে পারছি না।

তোরা পুরুষ মানুষ মেয়েদের ব্যথা বুঝতে চাইবি না জানি। শোন্ জাভেদ, শিশুকাল থেকে ফুল্লরা আর তুই খেলার সাথী।

জানি আমি।

ওকে তুই অবহেলা করতে পারবি না।

কে বললো ওকে আমি অবহেলা করি। তবে ও আমাকে যখন তখন বিরক্ত করতে পারবে না।

ফুল্লরা আরও উচ্ছ্বসিতভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কিন্তু কোনো কথা বলতে পারলো না।

নূরী বললো–জাভেদ, ফুল্লরাকে তুই অবহেলা করতে পারবি না। ও যাতে খুশি হয় তাই তোকে করতে হবে।

মায়ের কথা শুনে আর একবার হো হো করে হেসে উঠলো জাভেদ, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেলো সে আস্তানার বাইরে।

আস্তানার বাইরে সবাই অশ্ব আর অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো।

জাভেদ আর নূরী এসে দাঁড়াতেই অনুচরগণ নিজ নিজ অশ্বের লাগাম চেপে ধরলো।

রহমানও তাদের সঙ্গে চলেছে।

রহমান অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসতেই জাভেদ এবং নূরী নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

অশ্বগুলো একসঙ্গে এবার উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

*

বনহুর সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গিয়ে পুনরায় ভেসে উঠলো। প্রচন্ড প্রচন্ড ঢেউগুলোর বুকে কখনও তলিয়ে যাচ্ছে আবার কখনও ভেসে উঠছে। প্রাণপণে সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে বনহুর।

কিন্তু ভয়ংকর তরঙ্গের বুকে কতক্ষণ সাঁতার কাটা যায়।

নাকেমুখে নোনা পানি প্রবেশ করছে বনহুরের।

অনেক কষ্টে এতক্ষণ নিজকে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করছে বনহুর। কিন্তু কতক্ষণ, একসময় তলিয়ে গেলো সে।

যখন সংজ্ঞা ফিরলো তখন দেখলো একটি ষ্টিমারের বেডে শুয়ে আছে সে। তার পাশে একজন পুরুষ, তার দেহে নাবিকের পোশাক।

বনহুর চোখ মেলে তাকাতে দেখে লোকটা অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করলো একজন বৃদ্ধ ও এক তরুণ। তাদের শরীরেও নাবিকের পোশাক।

বনহুর চোখ মেলে তাকাতে দেখে ওরা খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হলো।

বনহুর ভাবলো সে মরেনি, জীবিত আছে।

মনে মনে খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো।

বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়ে অদ্ভুত ভাষায় কিছু জিজ্ঞাসা করলো বনহুরকে।

বনহুর বুঝতে পারলো না একবর্ণ তবু সে মাথা দুলিয়ে বললো–ভাল আছি।

বৃদ্ধের সঙ্গী তরুণটা করতালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলো। বনহুর কণ্ঠ শোনামাত্র বুঝতে পারলো তরুণটা পুরুষ নয়–সে তরুণী।

বনহুর বড় ক্লান্তি বোধ করছিলো তাই চোখ বন্ধ করলো।

বৃদ্ধ তরুণীটাকে কিছু বললো।

তরুণী বেরিয়ে গেলো এবং একটু পরে ফিরে এলো, তার হাতে একটা বাটিতে কিছু তরল পদার্থ।

বৃদ্ধ বাটিটা হাতে নিয়ে বনহুরকে তুলে ধরে তাকে খাবার জন্য অনুরোধ জানালো।

বনহুর বড় পিপাসা অনুভব করছিলো তাই কোনো রকম আপত্তি না করে বাটির তরল পদার্থ। ঢক ঢক করে পান করলো।

বড় সুস্বাদু মনে হলো ঐ মুহূর্তে তরল পদার্থগুলো। কোনো ফলের রস বলেই মনে হলো বনহুরের কাছে।

বনহুর এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করলো। অনেক কিছু প্রশ্ন তার মনে জমা হচ্ছে কিন্তু এরা যে ভাষায় কথা বলছে সে ভাষা মোটেই বনহুর বুঝতে পারছে না এবং সে যা প্রশ্ন করবে তাও তারা বুঝতে পারবে না, কাজেই সব প্রশ্ন মনেই চেপে রাখলো বনহুর সে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবার পর আর কিছুই স্মরণ করতে পারছে না। এরা কারা? কেমন করেই বা তারা তাকে পেলো? কেনই বা তারা তাকে তাদের ষ্টিমারে তুলে নিলো। বনহুরের মনে হচ্ছে ষ্টিমারখানা তাদের দেশের মত স্বাভাবিক নয়। এটা একটা আশ্চর্য ধরনের যান বলা যায়।

বনহুর দুচোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ বসবার পর বেরিয়ে গেলো।

সে বেরিয়ে যাবার পূর্বে তরুণীটিকে কিছু বলে গেলো।

অপর ব্যক্তি যে প্রথম ছিলো সেও হয়তো তার কাজে বেরিয়ে গেলো।

চোখ মেলে তাকালো বনহুর, দেখলো তরুণী তার শিয়রে বসে আছে। যদিও তার দেহে পুরুষের পোশাক, মাথার চুল পুরুষদের মত ছোট করে ছাটা তবু তার চেহারার মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা লাবণ্যময় ভাব।

বনহুর তাকালো ওর মুখের দিকে।

ভারী মিষ্টি ওর চেহারা।

ডাগর ডাগর দুটি চোখে মায়াভরা চাহনি। গায়ের রং বেশি ফর্সা নয়, শ্যামলা। বনহুরকে তাকাচ্ছে দেখে মিষ্টি হেসে সরল কণ্ঠে কিছু বললো।

বনহুর তার একটা শব্দও বুঝতে পারলো না। মাথা নাড়লো বনহুর, ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলো সে কিছু বুঝতে পারছে না।

তরুণীও আঁচ করলো লোকটা তার কথা মোটেই বুঝতে পারছে না।

তরুণী ব্যথা অনুভব করলো।

আরও একটু সরে এলো বনহুরের পাশে। মাথায় হাত রাখলো।

বনহুরের কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিলো।

বনহুর ওকে বাধা দিলো না।

বনহুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো তরুণী।

*

একদিন দুদিন তিন দিন।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো বনহুর।

ষ্টিমারখানা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের, কতকটা কুমিরের মত আকার।

সামনে মুখটা কুমিরের হার মত।

পাশে রেলিং ঘেরা ডেক আছে।

বনহুর এখন ভাল আছে, খাবার পায় তাজা ফলের রস। যত্ন পায় প্রচুর কিন্তু সে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না।

তরুণী এ ষ্টিমারে কাজ করে, খালাসির কাজ। বৃদ্ধ তার বাবা, এটুকু অনুধাবন করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো বনহুর।

তরুণী মাঝে মাঝে এসে পাশে বসে, কিছু বলতে চেষ্টা করে হয়তো বলে তুমি কে? তোমার দেশ কোথায়? তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি সমুদ্রগর্ভে গেলে কেমন করে? বনহুর তাদের ভাষা না বুঝলেও মনোভাব বুঝতে পারে। কিন্তু বুঝে কি হবে বোঝাতে সক্ষম হয় না।

ক্ষুধা পেলে পেট আর মুখ দেখিয়ে ইশারা করে বনহুর।

তরুণী এ কদিনে সব বুঝে নিয়েছে, কথা না বুঝলেও ইশারায় চলে সব কথা।

কদিনেই বনহুরকে তরুণী বন্ধুর আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে।

নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো বনহুরের কেটে যাচ্ছিলো কোনো রকমে। তরুণীর নাম নিশো। বনহুরের নির্জন নিঃসঙ্গ মুহূর্তের সঙ্গী নিশো।

ওর সরল সহজ চালচলন বড় ভাল লাগে বনহুরের। যখন সে ডেকে এসে দাঁড়ায়, নিশো এসে দাঁড়ায় পাশে।

নীল আকাশে হালকা মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসে নিশো।

ওর পাঞ্জাবীপরা দেহটা দুলে দুলে কেঁপে উঠে হাসির সঙ্গে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলোর মত।

বনহুরও হাসে, তাকিয়ে দেখে নেয় আকাশটার দিকে।

নিশো সমুদ্রের ঢেউগুলোর দিকে দেখিয়ে হাসে। কিছু বলতে চায় কিন্তু বলা হয় না। বাপু এসে দাঁড়ায় পাশে।

বনহুরের পিঠ চাপড়ে আদর করে বৃদ্ধ।

নিশো হাসে।

হাসি ছাড়া নিশোর আর কি আছে যা সে উপহার দেবে বনহুরকে।

জাহাজ নয় ষ্টিমার।

তিনজন চালক।

আর যাত্রী দুজন বলা চলে। বৃদ্ধ আর তার কন্যা নিশো। বনহুর আসার পর তিনজন হয়েছে।

এরা কোথায় চলেছে।

কেন চলেছে?

কি এদের উদ্দেশ্য কিছু জানে না বনহুর। কাগজপত্র কিছু পেয়েছিলো কিন্তু সে ভাষা বনহুর বুঝতে পারেনি।

বনহুর তবু চেষ্টা করছিলো বোঝার।

বিফলকাম হয়েছে।

অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বনহুর প্রতীক্ষা করছে কবে তীরে পৌঁছবে তারা।

এমনিভাবে হাঁপিয়ে পড়ে বনহুর।

যখন নির্জনে একা বসে বসে ভাবে বনহুর তখন নিশো এসে পাশে বসে। উড়ে চলা মেঘ আর আকাশ; কখনও সমুদ্রে–এই নিয়ে চলে তাদের আনন্দ উল্লাস।

একদিন বনহুর ঘুমিয়ে ছিলো।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো। কেউ তার শিয়রে বসে কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছে। বনহুর ইচ্ছা করেই নিশ্চুপ রইলো। ধীরে ধীরে দুখানা ঠোঁট নেমে এলো বনহুরের কপালের উপরে।

উষ্ণ একটা নিশ্বাস।

বনহুর একটু নড়ে উঠলো।

অমনি ছুটে পালিয়ে গেলো নিশো।

*

মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছে জাভেদ তার দলবল নিয়ে। শেষ পর্যন্ত বিফল হলো জাভেদ।

নূরীর বাম হাতে একটা তীরফলক বিদ্ধ হওয়ায় সে ভীষণ কাতর হয়ে পড়েছে।

জাভেদ তাই ইচ্ছা থাকলেও বেশিক্ষণ লড়াই করতে পারেনি।

নূরীকে নিয়ে তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

জাভেদের মনের অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

কান্দাই আস্তানায় ফিরে এসে সে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

শুধু নুরীই আহত হয়নি, ওদের তিনজন অনুচরও নিহত হয়েছে।

লাশ নিয়ে এসেছে জাভেদের দল।

তবে জাম্বুরীদেরও বেশ কয়েকজনকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে তারা। আশাকে উদ্ধার করতে না পেরে জাভেদ ভীষণ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সে একাই পুনরায় জাম্বুরীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে বলে মনস্থ করে নিলো।

রহমান বললো–মোটেই সমীচীন হবে না, কারণ এতগুলো লোক গিয়েও তাদের কাবু করা সম্ভব হলো না, আর তুমি একা গিয়ে আশাকে উদ্ধার করে আনবে?

জাভেদ বললো–হা।

রহমান বললো–অসম্ভব।

কেন অসম্ভব?

তার প্রমাণ তো দেখলে জাভেদ? বললো নুরী।

নূরী শয্যায় শায়িত ছিলো, তার পাশেই কথা হচ্ছিলো রহমান আর জাভেদের।

নুরী আহত তবু সে একেবারে সংজ্ঞা হারা হয়ে পড়েনি। জাভেদকে বললো–রহমান যা বলেছে তা সত্য, তুমি একা জাম্বুরীদের সঙ্গে যুদ্ধে পারবে না বরং আটকা পড়ে যাবে।

জাভেদ বললো–আমি হাঙ্গেরী কারাগার থেকে বাপুকে উদ্ধার করেছিলাম বালক বয়সে। আর এখন আমি অনেক অনেক বড় হয়েছি। একটু থেমে বললো–আশা, আম্মু বন্দী থাকবে আর আমরা নিশ্চিন্ত থাকবো, এ হতে পারে না। আমাদের তিনজনকে ওরা হত্যা করেছে। আমার আম্মুকে আহত করেছে, আমি কিছুতেই ওদেরকে রেহাই দেবো না।

নূরী কাতর কণ্ঠে বলে–আমার কথা শোনো জাভেদ। ওরা বড় হিংস্র, বড় কঠিন।

আম্মু, আমিও কম নই। আমি জাম্বুরীদের জান নিয়ে তবে ছাড়বো।

নূরী এবং অন্যান্য সবাই যারা সেদিন যুদ্ধে গিয়েছিলো তারা বহু নিষেধ করা সত্ত্বেও জাভেদ অশ্ব নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু আস্তানার বাইরে বেরিয়ে আসতেই ফুল্লরা ওর পথ আগলে দাঁড়ালো।

ডান হাতখানা প্রসারিত করে দিয়ে বললো–না, তোমাকে যেতে দেবো না।

জাভেদ বিস্ময়ভরা চোখে তাকালো ফুল্লরার মুখের দিকে।

ফুল্লরা ঘাবড়ালো না, বললো–যেখানে তোমরা এতগুলো লোক গেলে তবু জিততে পারলে না, আর তুমি একা।

গম্ভীর কণ্ঠে বললো জাভেদ–পথ ছাড়ো।

না।

ছাড়ো বলছি।

না, আমি পথ ছাড়বো না।

জাভেদ কিছু বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়ালো নূরী। বললো–ফুল্লরা, ওকে যেতে দে। আমার বারণ শুনলো না, আর তোর বারণ শুনবে?

ফুল্লরা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো।

চলে গেলো জাভেদ।

অশ্বপদশব্দ শোনা গেলো শুধু।

*

নিস্তব্ধ রাত।

বনহুর এসে দাঁড়ালো খোলা ডেকে।

রাত কত তা অনুমান করে বুঝতে পারলো বনহুর–তিন অথবা চারটা হবে।

আকাশে অসংখ্য তারার মালা।

হঠাৎ মনে হলো কেউ বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো। হাল্কা পদশব্দে ফিরে তাকালো বনহুর, বললো–নিশো তুমি।

কিন্তু পরমুহূর্তেই স্মরণ হলো নিশো তো তার কথা বুঝতে পারে না। কোনো জবাব তাই সে দিলো না।

বনহুর এগিয়ে এলো।

নিশো মাথা নিচু করে আছে।

বনহুর বুঝতে পারে না ওর কথা তাই কিই বা জিজ্ঞাসা করবে। নিশো যখন খুশি থাকে তখন শুধু হাসি দিয়ে বনহুরকে সম্ভাষণ জানায়। আর যখন বিষণ্ন থাকে তখন তার মনের কথা বোঝা যায় না। শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নিচু করে।

বনহুর নিশোর নিকটস্থ হয়েই বুঝতে পারে সে প্রসন্ন নয়। নিশ্চয়ই ওর কিছু একটা হয়েছে।

বনহুর আলগোছে নিশোর কাঁধে হাত রাখলো।

সঙ্গে সঙ্গে নিশো বনহুরের হাতের উপর মাথাটা কাৎ করে উচ্ছ্বসিতভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বনহুর নির্বাক হয়ে গেলো।

ওর কি এমন দুঃখ বা ব্যথা বনহুর জানে না। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারবে তাও পারে না। কেন নিশো কাঁদছে জানে না বা বুঝতে পারে না বনহুর।

নিশো! কথা বলে নিশো? কি হয়েছে তোমার? বনহুর ওকে বললো।

নিশো শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বনহুর ওর চিবুকটা তুলে ধরলো।

নিশো আলগোছে মাথাটা বনহুরের বুকে রাখলো। কিন্তু কয়েক মিনিট মাত্র, তারপর ঝড়ের মত চলে গেলো সে সেখান থেকে।

বনহুর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো তারপর ধীর পদক্ষেপে নিশো যে পথে চলে গেলো সেই পথে অগ্রসর হলো।

কিন্তু নিশোর ক্যাবিনের নিকট পৌঁছে দেখলো ক্যাবিনের দরজা বন্ধ।

বনহুর ফিরে এলো তার নিজের ক্যাবিনে। শয্যায় শয়ন করলো, কিন্তু ঘুম আর তার চোখে এলো না। নিশো কেন কাঁদলো, কি হয়েছে, কি তার ব্যথা। বনহুর এত দীপ্ত বুদ্ধিমান হয়েও একটা মেয়ের মনের কথা বোঝে না….

অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

ভোরে ঘুম ভাঙবার পূর্বে নিশো এসে হাজির। ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলো বনহুরকে ফিরে ফিরে নিরাংও

বনহুর চোখ মেললো।

কিন্তু নিশো কথা বললো না, শুধু তাকিয়ে রইলো বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে। নিশোকে আজ পূর্বের ন্যায় স্বপ্ন মনে হচ্ছে। কাল তবে এমন করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো কেন?

কি ছিলো তার মনের কথা?

কিন্তু এর জবাব সে হয়তো কোনোদিনই পাবে না।

নিশো উচ্ছ্বসিতভাবে কিছু বললো। ইংগিতে দেখালো বাইরের দিকে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো এবং নিশোর সংগে বেরিয়ে এলো।

ডেকে দাঁড়িয়ে নিশো আঙ্গুল দিয়ে দেখলো সম্মুখ দিকে। খুশিতে ডগমগ তার চোখ দুটো। এত খুশি তাকে দেখেনি বনহুর এ কদিনে। বনহুর দেখলো দূরে কালো রেখার মত নজরে পড়ছে।

বনহুর এতক্ষণে বুঝতে পারলো নিশোর আনন্দ হওয়ার কারণটা।

দূরে তীর নজরে পড়ছে।

নিশোদের ষ্টিমারখানা এবার তীরে পৌঁছবে সে জন্যই এত খুশি খুশি লাগছে তাকে।

বনহুর নিজেও কম খুশি হয়নি।

তীরে পৌঁছতে পারলে আবার সে স্বদেশে ফিরে যেতে পারবে। বনহুরকে নিশো আংগুল দিয়ে বারবার দেখিয়ে দিচ্ছিলো তীরটা।

বনহুর বললো–আমি বুঝতে পেরেছি! এজন্য আমি নিজেও আনন্দ বোধ করছি।

যদিও বনহুর জানে নিশো তার কথার একবর্ণও বুঝতে পারবে না। তবু সে বলে।

নিশো কি বুঝলো, শুধু মাথা দোলালো।

উচ্ছ্বাস নিয়ে নিশো দাঁড়িয়ে আছে।

পাশে বনহুর।

ওর বাবা এক সময় এসে দাঁড়ায়।

আজ তাকেও বেশ প্রফুল্ল মনে হচ্ছে।

বনহুর এক সপ্তাহ হলো এদের ষ্টিমারে আশ্রয় পেয়েছে। কেমন করে এরা তাকে পেলো বা উদ্ধার করলো আজও তা সে জানে না। জানার ইচ্ছা থাকলেও জানতে পারবে না বনহুর, কারণ আজ পর্যন্ত ওদের কথার একবর্ণও বুঝবার ক্ষমতা হয়নি, তাই বনহুর এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছে।

প্রাণে যে বেঁচে আছে এবং সেই মহাতরঙ্গময় সমুদ্র গবর থেকে যে উদ্ধার পেয়েছে এটাই তার বিস্ময়।

নিশো মাঝে মাঝে করতালি দিয়ে লাফা–লাফা শব্দ উচ্চারণ করছিলো।

লাফা, মানেটা কি জানে না বনহুর।

তাই সে নীরব রয়েছে।

প্রতীক্ষা করছে তীরটাকে কাছে পাবার জন্যে।

*

ঘন্টা কয়েকের মধ্যে তীর সন্নিকটে এসে গেলো।

বনহুর পকেট হাতড়ে বের করলো তার ক্ষুদে বাইনোকুলারখানা। সমুদ্রের অতলে বাইনোকুলারখানা হারিয়ে যায়নি, সে জন্য খুশি হলো বনহুর।

বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে তাকালো বনহুর তীরের দিকে।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সবকিছু।

নির্জন জঙ্গল।

জনপ্রাণী কিছুই নজরে পড়ছে না।

কেমন যেন মায়াপুরীর মত লাগছে জঙ্গলটা। একটা ভীতিভাব ছড়িয়ে আছে।

সম্পূর্ণ অজানা জঙ্গল।

নিশো বা তার বাবা বনহুরের কোনো কথা বুঝতে পারে না, নাহলে সব বুঝিয়ে বলতে বনহুর। এ জঙ্গলে অবতরণ করা উচিত হবে কিনা কে জানে।

বনহুর বাইনোকুলারখানা নিশোর হাতে দিয়ে দেখতে ইংগিত করলো।

নিশো বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে লাফাতে শুরু করলো, পরক্ষণেই বাইনোকুলারখানা পিতার হাতে দিয়ে বললো–লাফাংসু–লাফাংসু।

পিতা বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখলো, তারপর বললো–লাফাসিং হুম সিয়াংমো

বনহুর বুঝলো লাফাসুং মানে দেখো আর লাফালিংয়া মানে দেখলাম অথবা দেখেছি

অল্পক্ষণেই তীরে পৌঁছে গেলো ষ্টিমারখানা।

ষ্টিমার থেকে নেমে পড়লো ওরা তীরে।

কতদিন পর মাটির স্পর্শ পেয়ে সবাই ওরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো।

নিশো তো লাফালাফি শুরু করে দিলো।

ওকে সবচেয়ে বেশি আনন্দমুখর লাগছে।

বনহুরের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো, ওর যেন কত পরিচিত লোক বনহুর।

নিশোর পিতা রাইফেল জাতীয় অস্ত্র কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে পড়লো।

অন্যান্য যারা ছিলো তারাও এক একজন অস্ত্র নিয়ে নেমে পড়লো। সবাই মিলে এগুলো নতুন জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

কিন্তু বেশিদূর তারা এগুতে পারলো না, হঠাৎ করে একদল অদ্ভুত মানুষ আক্রমণ করে বসলো তাদের সবাইকে।

তাদের চেহারা বিদঘুটে।

সমস্ত দেহে নানা ধরনের বিচিত্র নক্সা আঁকা। লাল টকটকে চোখ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। মাথার চুলগুলো সজারু কাঁটার মত খাড়া। হাতে পাথর দিয়ে তৈরি বর্শাফলক।

একেবারে নির্জন, জনপ্রাণীহীন জঙ্গলে হঠাৎ করে এমন ধরনের অদ্ভুত মানুষের আবির্ভাব ঘটবে ভাবতেও পারেনি কেউ।

নিশো আর তার পিতা রাইফেল উঁচু করে ধরলো।

বনহুর ইংগিত করলো রাইফেল নিচু করে নিতে। ওরা আক্রমণ করলেও এখনও কারও ওপর আঘাত হানেনি।

এরা যদি আঘাত হানে তাহলে হয়তো ঘটনা ভয়ংকর দাঁড়াবে। তাই বনহুর চাইলে প্রথমে সন্ধি করতে।

নিশো ও তার পিতা রাইফেল নামিয়ে নিতেই তার অন্যান্য সঙ্গিগণও রাইফেল নামিয়ে নিলো। জংলীদল ঘেরাও করে ফেলেছে তাদের।

বনহুর ওদের দলপতির দিকে হাত বাড়িয়ে বন্ধুত্ব করতে চাইলো।

দলপতিও হাত বাড়িয়ে বনহুরের সঙ্গে করমর্দন করলো।

নিশো ও তার বাবা এতে খুশি হলো।

চোখেমুখে খুশির উচ্চস ফুটে উঠলো তাদের।

বনহুরকে জংলী সর্দার কিছু জিজ্ঞাসা করলো।

বুঝতে না পারলেও বনহুর ইংগিতে বুঝিলে দিলো তারা বিপদে পড়েছে এবং বিপদে পড়েই এই অজান জঙ্গলে অবতরণ করেছে।

জংলী সর্দার হয়তো কিছু অনুধাবন করে নিলো। সে সহানুভূতি জানিয়ে সবাইকে আমন্ত্রণ জানালো।

জংলীসর্দারের মহত্ত্ব মুগ্ধ করলো বনহুরকে।

বনহুর নিশো ও তার পিতাকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য ইংগিতে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু নিশোর বাবা কিছুতেই জংলীদেরকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ওদের ভীষণ চেহারা দেখে নিশো ও তার বাবা খুব ভয় পেয়ে গেছে।

বিশেষ করে জংলী সর্দার নিশোর দিকে বারবার লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছিলো।

অবশ্য বনহুর নিজেও এটা লক্ষ্য করেছে।

তবু ওরা বাধ্য হলো জংলীসর্দারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে।

জংলী সর্দার দলবল নিয়ে তাদের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

নিশো কিন্তু বারবার ভীত দৃষ্টি নিয়ে বনহুরের দিকে তাকাচ্ছিলো। কখনও বা পিতার হাতখানা জড়িয়ে ধরছিলো মজবুত করে।

না জানি কোন বিপদ আবার ঘনিয়ে আসছে কে জানে।

বনহুর নিশো ও তার দলবল সহ জংলী সর্দারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তার সঙ্গে চললো।

সত্যি আশ্চর্য জঙ্গল বটে।

এতটা পথ তারা জঙ্গল অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে কিন্তু একটা বন্য জীবজন্তুও তার নজরে পড়লো না।

গোটা জঙ্গল জুড়ে যেন ঐ জংলীদল বিরাজমান।

একসময় তারা বেশ একটা ফাঁকামত জায়গায় এসে পৌঁছে।

বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘর তৈরি করা হয়েছে।

বনহুর বুঝতে পারলো জংলীসর্দারের বাড়ি এটা আর গোটা জঙ্গলটা তার রাজ্য।

জংলীরা যারা তাদের ঘেরাও করে নিয়ে এলো তারা ছাড়াও আরও জংলী নরনারী সেখানে জামায়েত ছিলো।

সর্দার ও দলবল আসতেই জংলীদল অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো।

সর্দার কাঠের তৈরি মঞ্চের উপর উঠে গেলো।

বনহুর ও নিশোকে উপরে উঠে যাওয়ার জন্য ইংগিত করলো সে।

বনহুর একবার পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলো তার ক্ষুদে পিস্তলখানা ঠিক আছে কিনা। এসব বনহুরের প্যান্টের গোপন পকেটে থাকতো। এগুলো তার বিপদ মুহূর্তের সাথী। অতি সাবধানে এগুলো রক্ষিত ছিলো, তাই সমুদ্রের ভয়ংকর তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েও এগুলো তার সঙ্গছাড়া হয়নি।

বনহুর নিশোর ডান হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে কাঠের তৈরি উঁচু মঞ্চের উপরে উঠে গেলো।

নিশোর পিতা দলবল নিয়ে বসলো নিচে কাঠের তৈরি মাচাঙ্গের উপর।

সর্দারের নির্দেশে শুরু হলো নাচগান।

সে কি উক্তট গানের সুর।

কজন পুরুষ ঢাক বাজাতে শুরু করলো। আর কজন নারী নাচতে লাগলো।

জংলী নারীদের দেহে এক টুকরো চামড়ার আবরণ ছাড়া আর কোনো আবরণ ছিলো না।

ধেই ধেই করে নাচছে ওরা আর ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গান গাইছে।

এলো খানাপিনা!

কিছু কাঁচা মাংস আর নরমুন্ড ভর্তি কোনো নেশাকর গাছের রস।

বনহুর নিজের দলবলকে লক্ষ্য করে ইংগিতে নিষেধ করে দিলো তারা যেন এসব না খায়। নিশো বনহুরের ইংগিত বুঝে নিলো, সে ঐ সব খাদ্য গ্রহণ করলো না।

এমন কি অন্যান্য সঙ্গীও খেলো না।

সর্দার ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো।

তাদের দেওয়া খাদ্যসম্ভার না খাওয়ায় সর্দার রাগতভাবে কিছু উচ্চারণ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে জংলীরা নাচগান বন্ধ করে দিলো এবং মুহূর্তে ঘেরাও করে ফেললো তাদের সবাইকে।

*

জাভেদ অশ্ব নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো জাম্বুরীদের আস্তানায়। জাম্বুরীরা আশাকে একটা গাছের গোড়ালির সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবার আয়োজন করেছে।

তাদের কয়েকজন অনুচরকে ওরা হত্যা করেছে, এ কারণে তারা হত্যা করবে আশাকে। জাভেদকেও জাম্বুরীরা পাকড়াও করে এনেছিলো কিন্তু আটকে রাখতে পারেনি, সে সব বাধা–বিঘ্ন উপেক্ষা করে পালাতে সক্ষম হয়েছে। তারপর দলবল নিয়ে এসে তাদের সাথে যুদ্ধও করেছে।

জাভেদ সহসা আক্রমণ করে বসেছে জাম্বুরীদের। তারা জানতো না হঠাৎ রাতের অন্ধকারে কেউ তাদের এভাবে আক্রমণ করবে। জাভেদ রাইফেল নিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে আছে তীরধনু।

আশাকে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে চারপাশে শুকনো কাঠ স্থূপাকার করে অগ্নি সংযোগ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জাভেদ তাদের আক্রমণ করে বসেছে।

চালালো সে গুলীর পর গুলী।

অন্ধকারে আর্তনাদে ভরে উঠলো গভীর জঙ্গল।

ততক্ষণে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে আশার চারপাশে স্তূপাকার শুকনো কাঠগুলো। অন্ধকার লেলিহান অগ্নিশিখায় আলোময় হয়ে উঠে।

জাভেদের গুলী গিয়ে বিদ্ধ হয় এক একজন জাম্বুরীর বুকে। তীব্র আর্তনাদ আর লেলিহান অগ্নিশিখার দীপ্ত আলো গভীর জংলীটার নিস্তব্ধতা এক নিমিষে উধাও করে দিলো।

সেকি ভীষণ এক তান্ডবলীলা!

জাভেদ হন্য হয়ে উঠেছে। সে তার অশ্ব হাম্বুকে নিয়ে ক্ষিপ্তের মত গুলী ছুড়ছে।

জাম্বুরীরাও সজাগ হয়ে উঠলো, তারাও পাথর নির্মিত অস্ত্রনিক্ষেপ করে চললো ভীষণভাবে।

কিন্তু জাভেদ অত্যন্ত দ্রুত কাজ করছিলো, তার লক্ষ্য তার আশা আম্মুকে উদ্ধার করা। জাভেদ একাই তার রাইফেলের গুলীতে জর্জরিত করে ফেললো জাম্বুরীদের।

জাম্বুরীরা যখন জাভেদের গুলীর আঘাতে দিশেহারা হয়ে পড়লো এবং বিচ্ছিন্নভাবে পালাতে লাগলো এদিক ওদিকে তখন জাভেদ তার অশ্ব হাম্বুর পৃষ্ঠদেশ থেকে দ্রুত অবতরণ করে অগ্নিশিখার লেলিহান জিহ্বাকে পরিহার করে আশাকে গাছের গুঁড়ি থেকে মুক্ত করে নিলো এবং তুলো নিলো অশ্বপৃষ্ঠে।

আশা সংজ্ঞাহারার মত হয়ে পড়েছিলো। জাভেদ যে তাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়েছে তা সে জানতে পারলো না।

জাভেদ দুর্ধর্ষ জাম্বুরীদের ভয়ংকর বাধার প্রাচীর ভেঙে আশাকে উদ্ধার করে আনলো। কিন্তু আশার দেহে বহু স্থানে অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় সে কাহিল হয়ে পড়েছিলো।

জাভেদ হাম্বুর পিঠে তাকে ধরে রাখলো অত্যন্ত শক্ত করে।

হাম্বু দুধর্ষ অশ্ব।

তার চেহারার মধ্যে কোনো সৌন্দর্য ছিলো না। চোখগুলো বড় বড় ছিলো, দাঁতগুলো অন্যান্য অশ্বের তুলনায় বড় ছিলো। কাঁধে বা ঘাড়ে তার কোনো কেশর বা চুল ছিল না। দেহ ছিলো অস্বাভাবিক উঁচু এবং মোটা। তেমনি ছিলো হাস্তুর রাগ। জাভেদ ছোটবেলা হতেই হাস্তুর ভক্ত ছিলো। হাম্বুও জাভেদকে পছন্দ করতো অন্যান্য সবার চেয়ে বেশি।

হাম্বুর জন্ম বনহুরের আস্তানার অশ্বশালায়।

জন্মবার পর হাম্বুর চেহারা অন্যান্য অশ্বশাবকের চেয়ে একটু ভিন্ন ধরনের হয়ে ছিলো। তাই ওকে অনুচরগণ কেউ তেমন ভাল চোখে দেখতো না। বড় দুধর্ষ ছিলো হাস্তু, তাই ওর কাছে কেউ যেতে সাহস পেতো না।

হাম্বুকে জাভেদ শুধু আয়ত্তে আনতে পেরেছিলো তাই হাস্তু জাভেদের প্রিয়।

হাম্বুর পিঠে আশাকে তুলে নিয়ে ফিরে এলো জাভেদ কান্দাই আস্তানায়।

নূরী এবং নাসরিন আশার এ অবস্থা দেখে ভীষণ চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হলো। নুরী ব্যস্তসমস্ত হয়ে আশাকে নিয়ে নিজ গুহায় শুইয়ে দিয়ে সেবাযত্ন করতে লাগলো।

নাসরিন তাকে সহায়তা করে চললো।

নূরী আশাকে প্রীতির চোখে দেখতো, কারণ সে একবার নয় বহুবার বনহুরকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেছে। বনহুর নূরীর জীবন সাথী। তার জীবনের চেয়ে প্রিয়

বনহুর তাই আশার ঋণ সে কোনো দিন ভুলবে না বা ভুলতে পারে না।

নূরী জানতে আশা বনহুরকে ভালবাসে এবং তার সান্নিধ্য পাবার জন্য সে ব্যাকুল। নূরীর নারীমন মাঝে মাঝে আশার এই দুরাশাকে নিয়ে ক্ষুব্ধ হতো, রাগান্বিত হতো তার হুরকে কেন সে কামনা করে কিন্তু যখন সে বুঝলো আশা তাকে না পেলেও ভালবেসে যাবে বিনা স্বার্থে....

সংজ্ঞাহীন আশার শিয়রে বসে ভাবছিলো নূরী অনেক কথা যা তার জীবনকে বহুবার নাড়া দিয়েছিলো। আশাকে সে যদি স্বীকৃতি না দিতো তাহলে নিজ পুত্র জাভেদকে তুলে দিতো না আশার হাতে। আশা যেন জাভেদকে পুত্র হিসেবে পেয়ে বনহুরকে ভুলে যায় এই হলো নূরীর মনের কথা।

আশার সংজ্ঞা ফিরে এলো এক সময়।

স্মরণ করতে চেষ্টা করলো সে জীবিত না মৃত। কারণ যখন তার চারপাশে দাউ দাউ করে। আগুন জ্বলে উঠেছিলো, অসহ্য যন্ত্রণায় দেহটা তার ঝলসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো তখন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো সে!

এখন সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে সে আঁচ করলো কেউ বসে আছে তার শিয়রে। কে সেই ব্যক্তি যার এত দয়া? তবে কি জাভেদ জাভেদ—-তাকে উদ্ধার করে এনেছে কিন্তু তা কি করে সম্ভব হবে। এতগুলো ভয়ংকর জাম্বুরীর সঙ্গে সে একা পেরে উঠবে কি করে? তবে কে?

আশা চোখ মেলে তাকালো। পরক্ষণেই আশা চিৎকার করে ওঠে–একি! আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কে তুমি আমার শিয়রে, আমার কাছে এসো।

নূরী চমকে উঠলো আশা বলে কি, সে কি তবে অন্ধ হয়ে গেছে। বললো নূরী– আশা বোন, আমি নূরী–তোমার জাভেদের আম্মু।

তুমি নূরী।

হা।

কিন্তু কিন্তু আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সব অন্ধকার। আমি আমি অন্ধ হয়ে গেছি নূরী। আমার জাভেদ কই? সে তো ভাল আছে?

হাঁ জাভেদ, ভাল আছে। এতক্ষণ সে তোমার পাশে ছিলো, এখন সে পাশের গুহায় বিশ্রামের জন্য গেছে।

আমি এখন বুঝতে পারছি আমার জাভেদই আমাকে জাম্বুরীদের কবল থেকে উদ্ধার করেছে।

হাঁ বোন, তোমার কথা সত্যি।

আমি জানি জাভেদ যদি আমাকে উদ্ধার করে না আনতো তা হলে আমার এ দেহটা কখন ছাই ভস্মে পরিণত হতো! আমার পাশে লেলিহান অগ্নিশিখা যেভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করেছিলো তাতে আমার জীবিত থাকার কথা নয়।

বোন আশা, তুমি এখন ঘুমাও, সব পরে শুনবো।

না, আমি আর ঘুমাতে চাই না। আমি চিরদিনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমি তোমাকে দেখতে পাবো না, দেখতে পাবো না আমার জাভেদকে– ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে আশা।

নূরী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে–তোমার কিছু হয়নি, তুমি ভাল হয়ে যাবে।

না, আমি ভাল হবে না। আমাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিও না। আমি চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে গেছি। জাভেদ, ওরে আমার জাভেদ, কোথায় তুই

পাশের গুহা থেকে জাভেদ শুনতে পায় আশার আর্তকণ্ঠস্বর। ছুটে আসে সে আশার পাশে–আশা আম্মু, এই যে আমি....জাভেদ আশার পাশে বসে মুঠায় হাতখানা চেপে ধরে।

আশা তেমনি আর্তকণ্ঠে বলেনা না, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। জাভেদ তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না–আমি অন্ধ হয়ে গেছি।

তুমি অন্ধ হয়ে গেছে! এ তুমি কি বলছো আশা আম্মু?

হাঁ, তোমার আশা আম্মু দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কথাটা বললো নুরী।

জাভেদ তাকালো নূরীর মুখের দিকে।

একটা শব্দও সে উচ্চারণ করতে পারলো না, তার কণ্ঠ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে আশার মুখটা তুলে ধরলো নিজের মুখের কাছে।

জাভেদ ভাল করে তাকালো আশার চোখ দুটোর দিকে।

জাম্বুরীদের নিষ্ঠুর অগ্নিশিখা আশার চোখ দুটির দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করে নিয়েছে। জাভেদ বলে উঠলো–আম্মু, তোমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী আমি। আমি যদি সেদিন জাম্বুরীদের একজনকে হত্যা না করতাম তাহলে তারা তোমার প্রতি এ আচরণ করতো না। জানি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না।

এ তুই কি বলছিস জাভেদ। দৃষ্টিশক্তিই শুধু নয়, আমার জীবন আমি বিলিয়ে দিতাম তোর সঙ্গলের জন্য। জাভেদ, তুই আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিস। এ কথা আমি কোনো দিন ভুলবো না। তুই আমার সন্তান....

নূরী বলে উঠলো–সন্তান হয়ে মাকে উদ্ধার করেছে শত্রুর কবল থেকে এটা আর এমন কি করেছে? ওর কর্তব্য পালন করেছে এই যা।

আশা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—-আমি যে এখন তোমাদের বোঝা হয়ে রইলাম বোন নূরী।

ছিঃ! ও কথা বলো না আশা। তোমার কাছে আমরা চিরঋণী। তুমি আমার হুরের জীবন রক্ষা করেছো একবার নয় কয়েকবার। তুমি আমাদের কাছে কোনোদিনই অযত্ন পাবে না। আগে সুস্থ হয়ে নাও। এখন তুমি অত্যন্ত অসুস্থ বোন আশা।

আশার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো অশ্রুধারা।

তার মনের আকাশে একটা মুখ ভেসে উঠছিলো–বনহুরের মুখখানা। আশা আর কোনোদিন তার দৃষ্টি দিয়ে বনহুরকে দেখতে পাবে না, সেটাই হলো তার সীমাহীন দুঃখ।

আশা সম্মুখে হাত বাড়ালো–জাভেদ, ওরে তুই কোথায়?

এই তো আমি তোমার পাশে। জাভেদ আশার হাত দুখানা মুঠায় ধরে ফেললো।

আশা ব্যাকুল কণ্ঠে বললো–আমি আর কোনোদিন তোর মুখ দেখতে পাবো না এটাই আমার বড় দুঃখ। এ দুঃখ আমি কোথায় রাখবো বল।

জাভেদ বলে–আশা আম্মু, তুমি ভেবো না, আমি যেমন করে থোক তোমাকে সুস্থ করে তুলবো, তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবোই।

পারবি! ওরে পারবি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে? বললো আশা।

কেন পারবে না বোন। পৃথিবীতে অনেক কিছুই হয় যা অসম্ভব। তোমার দৃষ্টিশক্তিও আবার ফিরে পাবে। নূরী কথাগুলো বলে আশার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

আশা ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করলো।

এমন সময় ফুল্লরা এলো সেখানে।

নুরী বললো–ফুল্লরা, তোমরা এখানে বসো। আমি ওর পথ্য নিয়ে আসি।

ফুল্লরা বললো–যাও।

নূরী বেরিয়ে গেলো।

ফুল্লরা আশার ললাটে হাত রেখে বললো–কেমন আছো আশা আম্মু

আশা কোন জবাব দিলো না তার গড় বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো।

জাভেদ আর ফুল্লরা তাকালো উভয়ের মুখের দিকে।

[পরবর্তী বই দস্যু বনহুর ও নিশো]